সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুলাই ২০২৩

বিশ্বকে এক সুতোয় গাঁথার স্বপ্নে ভারত

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১ জুলাই ২০২৩ সাত বছর আগে এই দিনে ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে সংঘটিত নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো নিরীহ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ৯ জুলাই ২০২৩-এ মিরপুরে বাংলাদেশের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজে (ডিএসসিএসসি) কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণের জন্য ভারতের ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশন এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

ভারতীয় হাই কমিশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ১১ জুলাই ২০২৩-এ ভারতীয় রুপিতে (আইএনআর) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য চালু করতে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১৭ জুলাই ২০২৩-এ ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেল প্রকল্পের একটি নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ভারতীয় রেয়াতি লাইন অব ক্রেডিট-এর অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১৮ জুলাই ২০২৩ ঢাকায় গণভবনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ০৭ | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০ | জুলাই ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
সিকিম

সিকিম পূর্ব হিমালয় রেঞ্জে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভুটান, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে এর সীমানা। সিকিম শিলিগুড়ি করিডোরের কাছাকাছি, যা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী।

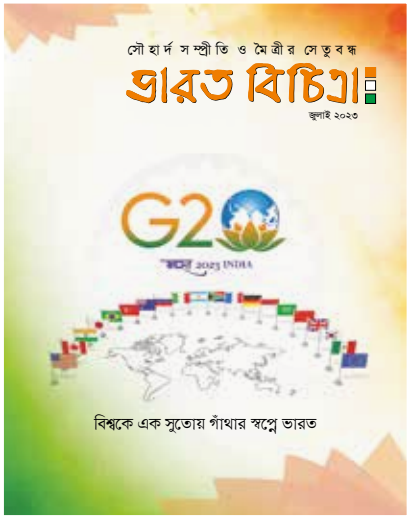

সূচিপত্র

প্রচ্ছদরচনা — জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে ভারতের নেতৃত্ব এবং পড়শিদের আকাঙ্ক্ষা
ড. আতিউর রহমান ০৩
প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্যে জি-টোয়েন্টি ॥ ড. রাশিদ আসকারী ০৬
জি-টোয়েন্টি ও সম্ভাব্য আলোকরেখা ॥ অরুণাংশু ভট্টাচার্য ০৯
জি-টোয়েন্টির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও বাস্তবতা ॥ দেবব্রত চক্রবর্তী ১২
বিশ্বকে এক সুতোয় গাঁথার স্বপ্নে ভারত ॥ মো. রেজাউল করিম ১৫
বৈশ্বিক শান্তিরক্ষায় জি-টোয়েন্টি ॥ নুরুল ইসলাম হাসিব ১৮

ফিচার — বাংলা সাহিত্যে লেখকদের ছদ্মনাম ॥ অঞ্জন আচার্য ২০

অনূদিত কবিতা — মঙ্গলেশ ডবরালের কবিতা ॥ অনুবাদ : অজিত দাশ ২২

পঙ্‌ক্তিমালা — ময়ুখ চৌধুরী ॥ শোয়েব শাহরিয়ার ॥ সুদীপ্ত মাজি
আবদুর রাজ্জাক ॥ অনুপম মুখোপাধ্যায় ॥ জাহিদ সোহাগ
চাণক্য বাড়ৈ ॥ হাশিম কিয়াম ॥ নিষাদ নয়ন
সুবর্ণা গোস্বামী ॥ কুশল ভৌমিক ২৪-২৫

প্রবন্ধ — মহিমময় জীবনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ ॥ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ২৬

মলায়লম ছোটগল্প — অন্য গ্রীষ্ম ॥ ই সন্তোষ কুমার ॥ অনুবাদ : তৃষ্ণা বসাক ২৯

ধারাবাহিক উপন্যাস — বকেয়া হিসেব ॥ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২

ছোটগল্প — সুলুকসন্ধান ॥ পাপড়ি রহমান ৩৬

কেন্দ্রবিন্দু — সিকিম ভারতের লুকানো রত্ন ॥ রীতা রাণী দেবনাথ ৪২

অর্থনীতি — রুপিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সুবিধা ॥ অনিন্দ্য আরিফ ৪৬

শেষ পাতা — পণ্ডিত শ্রী হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া ॥ ড. পূনম গুপ্তা ৪৮

সম্পাদকীয়

জি-২০ গঠনের প্রধান প্রস্তাবক কানাডার সাবেক অর্থমন্ত্রী পল মার্টিন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এবং অর্থমন্ত্রীগণের উপস্থিতির মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই ভারত জি-২০ গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সদস্য। এই ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিটি সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, অর্থমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ যোগ দেন। আরও আমন্ত্রিত হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠন।

এটি গ্রুপ অফ টোয়েনটি ফিন্যানস মিনিস্টারস অ্যান্ড সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নরস বা গ্রুপ অফ টোয়েন্টি পরিচয়ে খ্যাত বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সবচেয়ে বড় সংগঠন। ফোরামটি বৈশ্বিক অর্থনীতির পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের নানান সঙ্কট ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। বলা যায়, এটি বিবিধ বৈশ্বিক বিষয়ে সমন্বিত আলোচনার মঞ্চ।

বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। আজকের ভারতকে ঘিরে বিশ্বের কৌতূহল ও আকর্ষণ অসীম। দেশটির অর্থনীতিও বহুমুখী বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প, উৎপাদন, এবং বিভিন্ন সেবা ভারতের অর্থনীতির উৎসক্ষেত্র। ভারতের শ্রমশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষিখাত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তবে সেবাখাত ক্রমেই প্রসার লাভ করছে এবং ভারতের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব চলছে। এই উৎসবের অন্যতম গৌরবজনক আয়োজন জি-২০ সম্মেলন। এবং এতে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত। সভাপতিত্বও করছে ভারত সরকার। যা ভারতবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। বলা যায় এই আয়োজন বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীর শক্তি এবং সামর্থ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে। এটি ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সম্মান এবং গর্বের। জি-২০ এর বার্ষিক সম্মেলন ২০১১ সাল থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১ ডিসেম্বর থেকে জি-২০ দেশসমূহের সমন্বিত গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ভারত প্রজাতন্ত্রের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইতোমধ্যে ভারত সরকার জানিয়েছে, আসন্ন জি-২০ সম্মেলনের অগ্রাধিকারগুলো হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং স্থিতিশীল বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন, পর্যটনক্ষেত্র উন্নয়ন, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তি-সক্ষম উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতি মোকাবিলায় অর্থায়ন, বৈশ্বিক খাদ্য এবং শক্তি সুরক্ষা।

জি-২০ প্রেসিডেন্সি ভারতকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণে অবদান রাখার জন্য এক অনন্য সুযোগ করে দেবে। আশা করা যাচ্ছে, এই সুযোগ ভারতকে বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকায় উন্নীত এবং সমহিমায় উজ্জ্বল করবে। যা ভারতকে আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেবে।

কৌশলগত বহুপক্ষীয় সংগঠন জি-২০। যেহেতু বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিসমৃদ্ধ দেশগুলো এর সদস্য। সেহেতু এ সংগঠনের আগামী শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলনসহ সাইড বেঞ্চের বৈঠকগুলোতেও অতিথি দেশ হিসেবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ। ফলে, ভারতের বন্ধুপ্রতিম দেশ এমন আন্তরিক নিমন্ত্রণ পাবে এটা উভয় দেশের জন্য আনন্দের বার্তা বটে।

২০২৩ সালের শেষ দিকে ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জি-২০ এর সদস্য রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলন হবে। ভারতের সভাপতিত্বে অন্তত ১০০টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের সব 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'সহ ১০০টি ঐতিহাসিক সৌধ এক সপ্তাহের জন্য আলোকসজ্জায় উদ্ভাসিত হবে। সেখানে প্রতিভাত হবে জি-২০-এর সাদা, গেরুয়া, নীল ও সবুজ রঙের লোগোয় পদ্মফুলের ওপরে রাখা পৃথিবী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, ভারতীয় সংস্কৃতিতে, জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনেই পদ্মের ওপর উপবিষ্ট। ফলে, জি টোয়েন্টি লোগোতে, পৃথিবীকে একটি পদ্মের ওপরে রাখা হয়েছে। লোগোতে পদ্মের সাতটি পাপড়িও তাৎপর্যপূর্ণ। তারা সাতটি মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। সঙ্গীতের সর্বজনীন ভাষায় সরগমের স্বরের সংখ্যাও সাত। সঙ্গীতে, যখন সাতটি স্বর একত্রিত হয়, তারা নিখুঁত সরগম তৈরি করে। তবে প্রতিটি স্বরের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। একইভাবে, জি-২০ গোষ্ঠীর লক্ষ্য বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিশ্বকে একত্রিত করা। নিচে দেবনাগরি হরফে লেখা সংস্কৃত বাগ্‌ধারা 'বসুধৈব কুটুম্বকম', যার অর্থ, গোটা পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে এক পরিবার, ইংরেজিতে যা 'দি ওয়ার্ল্ড ইস ওয়ান ফ্যামিলি'। সবমিলে বলা যায়, বিশ্বকে এক সুতোয় গাঁথার স্বপ্নে ভারত অব্যাহত সাফল্য পাবে।

সকলের কল্যাণ হোক।

জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে ভারতের নেতৃত্ব এবং পড়শিদের আকাঙ্ক্ষা

ড. আতিউর রহমান

প্রচ্ছদরচনা

অগ্রসর অর্থনীতি আর উদীয়মান অর্থনীতির ১৯টি দেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত অনানুষ্ঠানিক ফোরামের নাম জি-টোয়েন্টি। এর ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন হবে এ বছরের সেপ্টেম্বরে। নয়াদিল্লিতে। করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, আর ইউরোপে চলমান যুদ্ধের কারণে এবারের সম্মেলন স্বভাবতই বিশেষ আগ্রহ জাগাচ্ছে। তার ওপর এবার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে প্রতিবেশী ভারত, এবং জি-টোয়েন্টি-এর সদস্য না হলেও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ আমন্ত্রণে এ সম্মেলনে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বিশেষ আমন্ত্রণে জি-টোয়েন্টি সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। দুই দেশই আশা করছে সেপ্টেম্বরের জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের পার্শ্বসভায় ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যখন বসবেন তা যেন মিনি সামিটে রূপ নেয়

এজেন্ডা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুদেশের সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকরা নিশ্চয় এই দিকটা খেয়াল রাখবেন। সব মিলিয়ে এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনটি আগামী দিনগুলোর ভূ-রাজনৈতিক পথনকশা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্ববহ হবে বলেই ধরে নিচ্ছেন সবাই।

নিঃসন্দেহে বিশ্ব অর্থনৈতিক-কূটনীতির জন্য বর্তমান সময়টি ভীষণ বৈরী। শীর্ষ সম্মেলনের আগেই জি-টোয়েন্টি-এর প্রস্তুতিমূলক সভা-মতবিনিময়গুলোতেই তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অগ্রসর, উন্নয়নশীল আর পিছিয়ে থাকা সকল অর্থনীতি ক্ষতির মুখে পড়লেও ভারতে অনুষ্ঠিত আগের একটি জি-টোয়েন্টি অর্থমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক থেকে এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছানোর খবর পাওয়া যায়নি। তবে অর্থমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সভাটি বেশ নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সেপ্টেম্বর নাগাদ এই অনৈক্যের পরিস্থিতি খুব বড় রূপ নেয় কি-না তাই নিয়ে আশঙ্কা করছেন অনেক বিশ্লেষক। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার এ ধরনের বৈশ্বিক সঙ্কটকালে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নীতি-প্রস্তাবনা হাজির করার জন্যই কিন্তু জি-টোয়েন্টি-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে ২০০৮-০৯-এর বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলায় জি-টোয়েন্টি সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই এবারেও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়া নিয়ে হতাশ না হয়ে, নতুন নতুন কৌশল নিয়ে এগুনোর পরিকল্পনা করাটিই সঠিক হবে। মনে হয় ভারত ঠিক তেমন কৌশলই গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে ২০১৮ সালে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জি-টোয়েন্টি-এর মূল প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম–পল মার্টিনের একটি বক্তব্য মনে করা যায়। তিনি বলেছিলেন, '...জি-টোয়েন্টি-এর লক্ষ্য হলো সকলের জন্য বিশ্বায়নের সুফল নিশ্চিত করা। ... আর বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক আর মন্ত্রীদের যখন একটি বদ্ধ ঘরে একান্তে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে অমিত ক্ষমতা তৈরি হয় সে বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে।' আসলেই তাই। সেকারণেই জি-টোয়েন্টি থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল আসবে না–এমন আশঙ্কার পাশাপাশি বিশ্বের নেতারা একত্রে বসে একটি সমাধানের পথ খুঁজে বের করবেন এমন আশার জায়গাও আমি দেখি। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই বিশ্ব সঙ্কট সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে এমনটি আশা করাটা নিশ্চয় অন্যায় হবে না। বিশেষ করে হালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ জি-টোয়েন্টি এর প্রধান প্রধান সদস্যদেশে নিজের অবস্থান ও ধারণা যথার্থ ভাবেই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন বলা চলে।

আগেই বলেছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এবার বিশেষ আমন্ত্রণে জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে দিল্লিতে 'ইনগোরাল লিডারস সেশন'-এ ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি বলেছেন, 'রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কালে বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতা এবং করোনা মহামারির অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একটি সুবিচারভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সকলে একযোগে কাজ করার এখনই সময়।' এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনের মূল থিম, 'এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ (One World, One Family, One Future)'–থেকেও আমরা একই বার্তাই পাই। এবার এ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সরকার পশ্চিমের দেশগুলোর দিক থেকে ব্যাপক চাপ থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে বৈরীতার পথে হাঁটছে না। আবার একই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকেও জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'এখন যুদ্ধের সময় নয়।' একদিকে মহামারি আর যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অস্থিরতা থাকলেও অন্যদিকে সকলে মিলে সমস্যা মোকাবিলার এমন আহ্বানও দৃশ্যমান রয়েছে। তবে ভারতের নেওয়া কৌশলটি কিন্তু বেশ ঝুঁকিপূর্ণও বটে। রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি সরবরাহের সুবিধে নিয়ে এমনিতেই ভারত পশ্চিমের কাছে খানিকটা প্রশ্নের মুখে রয়েছে। তাই খুবই সাবধানে তাকে কূটনীতির দাবার চাল দিতে হচ্ছে। তবে আশার কথা ভারতের রয়েছে খুবই সুদক্ষ একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেগোশিয়টর। তারা এই ভূরাজনৈতিক টানাপড়েনের সময় নিশ্চয় চৌকস দূতিয়ালির কাজটি করতে সক্ষম হবেন। আর এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর। তিনি এর আগে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিবও ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সাবধানী এই কূটনীতিক নিশ্চয় সবদিক সামলে জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যকে এক নয়া মাত্রা দিতে সক্ষম হবেন। বানারসে জি-টোয়েন্টি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় তিনি যে দূরদর্শী বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তাতেই প্রমাণিত হয় কতোটা বিচক্ষণতার সাথে তিনি তাঁর কূটনৈতিক কৌশলকে সফল করে চলেছেন।

সত্যি বলতে দুই দশকেরও আগে জি-টোয়েন্টি-এর শুরুটিই হয়েছিল বৈশ্বিক সঙ্কট মোকাবিলায় ছোট-বড় অর্থনীতির একযোগে কাজ করার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে। গেল শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই অনেকগুলো দেশই বিশ্ব অর্থনীতিতে উঠে আসতে শুরু করে 'ইমার্জিং ইকোনম' হিসেবে। ঐ সময় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাত বিষয়ে বহুজাতিক মঞ্চ হিসেবে ছিল জি৭, যেখানে প্রতিনিধিত্ব ছিল পশ্চিমের সাতটি উন্নত অর্থনীতির দেশের। তখনই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোতে তুলনামূলক ছোট অর্থনীতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব না থাকা নিয়ে ভাবিত ছিলেন অনেকেই। এই প্রেক্ষাপটেই এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়। রাশিয়া তার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সঙ্কটে পড়ে। অন্যদিকে ব্রাজিলেও মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে সঙ্কট ঘনীভূত হতে থাকে। এই সঙ্কট মোকাবিলার নীতি-প্রস্তাবনাগুলো সকল পক্ষের আলাপ-আলোচনার

২০০৮ এবং ২০০৯-এ জি-টোয়েন্টি-এর কার্যক্রমের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। মার্কিন হাউজিং মার্কেটে তৈরি হওয়া সঙ্কট তখন বিশ্বায়িত আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে

ভিত্তিতেই যেন দাঁড় করানো যায়, সেজন্যই জন্ম হয় জি-টোয়েন্টি-এর। বড় অর্থনীতির দেশগুলোর পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো থেকে প্রতিনিধিত্বশীল অর্থনীতির দেশগুলোকেও জি-টোয়েন্টি-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক ঋণের বিপরীতে দেয় চার্জের হার কমিয়ে আনা, দরিদ্র দেশগুলোর জন্য আর্থিক সাহায্য নিশ্চিত করার মতো বেশকিছু উদ্যোগসহ নানামুখী সংস্কারের যে নীতি-প্রস্তাবনাগুলো জি-টোয়েন্টি থেকে উঠে এসেছিল সেগুলো অনুসরণ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্কট সমাধানে সফলতা এসেছিল। সারা বিশ্বই এই অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কূটনীতির সুফল পেয়েছিল।

২০০৮ এবং ২০০৯-এ জি-টোয়েন্টি-এর কার্যক্রমের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। মার্কিন হাউজিং মার্কেটে তৈরি হওয়া সঙ্কট তখন বিশ্বায়িত আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আগে মার্কিনিদের তরফ থেকে জি-টোয়েন্টিকে রাষ্ট্রনায়কদের সম্মেলনে রূপান্তরের যে অনাগ্রহ ছিলো তা ওই সময়ে পরিবর্তিত হয়। ওই সময়ে (২০০৮-এ) বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের সভাপতিত্বে আর তার পরের বছর লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরপর দুটি জি-টোয়েন্টি সম্মেলন বিশ্ব অর্থনীতিকে বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। সাধারণত বড় ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখলেই বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো নিজ নিজ অর্থনীতিকে আলাদাভাবে সুরক্ষা দিতে বিভিন্ন রকম সংরক্ষণবাদি নীতির (Protectionism) আশ্রয় নিতে শুরু করে। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে সংরক্ষণবাদ কোনো সমাধান হতে পারে না। ২০০৮-০৯-এ জি-টোয়েন্টি-এর কল্যাণেই সংরক্ষণবাদের সম্ভাব্য বিস্তারকে রোধ করা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে জি-টোয়েন্টি-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি লরেন্স সামার্স ২০১৮ সালে বলেছেন, 'আর্থিক খাতের নিয়ম-নীতির সংস্কার এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সঙ্কট মোকাবিলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বিষয়ে ওই সময়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো না গেলে, ঐ আর্থিক খাতের সঙ্কটের ভয়াবহতা বহুগুনে তীব্রতর হতে পারত। ... সে সময় জি-টোয়েন্টি খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে জি-টোয়েন্টি প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকের মধ্যেই অন্তত দুই বার বৃহৎ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলার ক্ষেত্রে ত্রাতা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। এই ট্র্যাক রেকর্ডের কারণেই বর্তমানে চলমান সঙ্কটেও সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জি-টোয়েন্টি শীর্ষ বৈঠক থেকে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যায়। একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বৈশ্বিক বাস্তবতায় ভারত 'হোস্ট কান্ট্রি' হিসেবে তার কূটনৈতিক প্রভাব কতোটা খাটাতে সক্ষম হবে তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করবে এই সম্মেলনের সফলতা। বৈশ্বিক অর্থনীতির কেন্দ্র এশিয়ার দিকে সরে আসার প্রেক্ষাপটে জি-টোয়েন্টি-তে ভারতের সভাপতিত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হবে রাশিয়া ভারতের পুরোনো মিত্র এবং এই সঙ্কটের মধ্যেও ভারতে জ্বালানি ও সার সরবরাহে তারা সহায়ক ভূমিকাই রেখেছে। অন্যদিকে পশ্চিমের বাজারও ভারতের জন্য দরকারি। এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য করাকে কেবল চাপ হিসেবে না দেখে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সুযোগ হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে। যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির সরকার সে পথই বেছে নিয়েছে। গণমাধ্যমের খবরে এবং বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে পশ্চিমা বিনিয়োগকারিরা চীন থেকে সরে এসে অন্যত্র বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন। এ সুযোগে 'ইমার্জিং ইকোনমি'র দেশগুলোর এমএসএমই খাতে বিনিয়োগ, এসব দেশের কৃষিকে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে আরও বেশি করে যুক্ত করা, এবং অগ্রসর অর্থনীতিগুলোর সাথে বাকিদের মধ্যকার দক্ষতার ব্যবধান (skills gap) কমানোর ওপর জোর দেবে মোদি সরকার। একই সঙ্গে করোনার ধাক্কার পর পুনরুদ্ধারে মনোযোগের কারণে এসডিজি অর্জনের পথ থেকে যে বিচ্যুতি ঘটেছে সে ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার ওপরও বিশ্ব-নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাইবেন নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে ভারতসহ অন্য 'ইমার্জিং ইকোনমি'গুলোতে জ্বালানি, আর্থিক সেবা খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যে ঢেউ লেগেছে তাকে আরও বলশালী করতে বৈশ্বিক অংশীজনদের মধ্যে প্রযুক্তি বিনিময়ের ওপরও জোর থাকবে এবারের সম্মেলনে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন আর নারী উন্নয়নের এজেন্ডাগুলোকেও আরও বেশি মাত্রায় আনার চেষ্টা করবে ভারত, এমন ধারণা করা যাচ্ছে। অধিক ঋণে জর্জরিত দেশগুলোকে কি করে বিদেশি ঋণের পুনর্গঠন ও অবলোপনের সুবিধা দেওয়া যায় সে বিষয়েও জি-টোয়েন্টি এর অর্থমন্ত্রীরা আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শ্রীলংকা, জাম্বিয়া ও আফ্রিকার অনেকগুলো দেশেই চীনের ঋণ-নির্ভর বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট। সেই ঋণ পরিশোধে দেশগুলো বেশ বিপাকেই পড়েছে। জি-টোয়েন্টি এর শীর্ষ সম্মেলনে নিশ্চয় এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে বলে আশা করা যায়।

ভারত তার এই কল্যাণমুখী এজেন্ডা নিয়ে একা এগুতে পারবে না। 'গ্লোবাল সাউথ' বলে পরিচিত অপরাপর দেশগুলোর সমর্থনও তার দরকার হবে। এখানেই বাংলাদেশের বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। জি-টোয়েন্টি সম্মেলনকে সামনে রেখে তাই বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছয়দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন। এগুলো হলো- ০১) বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানবসমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পথকে সুগম করা, ০২) এসডিজির লক্ষ্যগুলোর পাশাপাশি বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করা, ০৩) স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে থাকা দেশগুলোর জন্য আলাদা তহবিল গঠন, ০৪) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে 'ডিজিটাল ডিভাইড' কমিয়ে এনে নারীসহ সকলকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ, ০৫) রোহিঙ্গা সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে সকল মানুষের নিজ দেশে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকারের প্রতি আরও বেশি সংবেদনশীলতা, এবং ০৬) প্রতিবেশী দেশ, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, ব্যক্তিখাত, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে নিয়ে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

বিশ্বায়নের এই যুগে একবিংশ শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ পেরিয়ে এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় পারস্পরিক সংঘর্ষ কিংবা সংরক্ষণবাদিতা নয়, গোটা মানবসভ্যতার টেকসই কল্যাণ আসবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংবেদনশীলতা থেকেই। ঠিক এ রকম কথাই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন জাতিসংঘে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায়। সেদিন তিনি আশাবাদী উচ্চারণে বলেছিলেন, '...আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে।' বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'নতুন বিশ্বে'র দিকে একটি সার্থক পদক্ষেপ হোক এবারের জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন, এই প্রত্যাশায়। •

ড. আতিউর রহমান
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

প্রচ্ছদরচনা

প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্যে জি-টোয়েন্টি

ড. রাশিদ আসকারী

উনিশটি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে জি-টোয়েন্টি গঠিত হয়েছে। সংখ্যার বিচারে মাত্র এক কুড়ি, কিন্তু গুরুত্ব বিবেচনায় এর ওজন অনেক বেশি। সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ৬৫%, বাণিজ্যের ৭৫%, অর্থনীতির ৮৫% অধিকার করে আছে জি-টোয়েন্টি-এর রাজ্য। অন্যদিকে আবার বিশ্ব কার্বন নিঃসরণের ৭৯% সংঘটিত হচ্ছে এদের দ্বারাই। সবমিলে বিশ্বের অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে জি-টোয়েন্টি-এর ভূমিকা সর্বদাই অগ্রগণ্য। আর সেই ভূমিকা পালনে যখন এত বড়ো সভ্য সঙ্ঘের পৌরোহিত্য ভারতকে করতে হয়, তখন তার গুরুত্ব আরো সম্প্রসারিত হয় বৈকি।

জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে, ভারত একটি চিরায়ত থিম বেছে নিয়েছে, যা ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। মহা উপনিষদের অমর বাণী–'বসুদেবা কুটুম্বকম' (বিশ্ব একটি পরিবার)-এর আলোকেই ভারতের জি-টোয়েন্টি প্রেসিডেন্সির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে

থিমটি গ্রহবাসী সমস্ত জীবনের, মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অণুজীব–মূল্য এবং গ্রহে এবং বৃহত্তর মহাবিশ্বে তাদের আন্তঃসংযুক্ততা নিশ্চিত করে। এটি LiFE (পরিবেশের জন্য লাইফস্টাইল)- এর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। পরিবেশগতভাবে ব্যক্তি ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত দায়িত্বশীল এবং টেকসই ভূমিকার দায়িত্ব ভারত গ্রহণ করেছে, যা ব্যক্তিগত জীবনধারা এবং জাতীয় উন্নয়ন উভয় পর্যায়েই মানবজাতিকে বিশ্বব্যাপী রূপান্তরমূলক অগ্রযাত্রার দিকে পরিচালিত করে এবং একটি নির্মল, সবুজ এবং সুনীল ভবিষ্যৎ রচিত হয়।

কোভিড-উপদ্রুত এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক মন্দার ভূত, মূল্যস্ফীতির বল্গাহীন অশ্ব এবং ঘোরতর জলবায়ু সঙ্কট মোকাবিলা জি-টোয়েন্টি সঙ্ঘের প্রধান বিবেচ্য হলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান বিশ্বনেতৃত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজ অনুধাবন এবং উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আইএমেফ-এর মতো সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মানুষের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করার কথাও ভেবেছেন। শুধু তাই নয়, ভারতের জি-টোয়েন্টি প্রেসিডেন্সি মানবতা এবং পরিবেশের মধ্যে একটি সুমধুর সহাবস্থান ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব বহন করে। প্রকৃতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, একুশ শতকের প্রযুক্তি-তাড়িত এবং দ্রুততম পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে, যেখানে বাস্তব, ডিজিটাল এবং জৈবিক জগতের মধ্যকার প্রভেদরেখা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে, এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিকস, ইন্টারনেট অফ থিংস, 3-D প্রিন্টিং, ন্যানোটেকনোলজি কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং মহাবিস্ময়ের রাজত্ব কায়েম করেছে, সেখানে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ল কেন? জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের বিনাশ, ভূমিক্ষয়, জলস্বল্পতা, বায়ুদূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এবং প্যানডেমিকের মতো গুরুতর আস্তিত্বিক সংকট সৃষ্টিকারী সমস্যা এবং তার সমাধানের মধ্যেই পাওয়া যাবে এ উত্তর। সংকটগুলো আন্তঃসংযুক্ত এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব এবং বিকাশের জন্যে হুমকিস্বরূপ।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP)-এর মতানুসারে, মানুষের ক্রিয়াকলাপ পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৭৫% পরিবর্তন করেছে এবং জীবনরক্ষার উপযোগী প্রাকৃতিক ক্ষমতা হ্রাস করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এই বলে সতর্ক করেছে যে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক-শিল্পস্তর থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। আন্তঃসরকারি বিজ্ঞান-নীতি প্ল্যাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস (IPBES) অনুমান করে যে, প্রায় এক মিলিয়ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) রিপোর্ট করেছে যে, বিশ্বব্যাপী দুই বিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তাসহ লাখ লাখ মানুষের জীবিকার জন্যে হুমকিস্বরূপ।

এই উদ্বেগজনক প্রবণতাসমূহের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে প্রকৃতি এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সকলের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক–সমস্ত স্তরে জরুরি এবং সমন্বিত পদক্ষেপের আহ্বান জানায় জি-টোয়েন্টি-এর ভারত প্রেসিডেন্সি। গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুতে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতি এবং অন্যান্য পক্ষসমূহের মধ্যে সংলাপ, ঐকমত্য এবং সহযোগিতা সহজতর করতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত।

প্রকৃতি, মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ঐতিহাসিক। প্রকৃতিকে সমীহ করার এবং তার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য ভারতের রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচিসমূহে প্রকৃতি, মানুষ এবং পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু সংরক্ষণের প্রতি অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতি, মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এক. পুনর্নবায়ণযোগ্য শক্তি : সৌর এবং বায়ু শক্তির মতো পুনর্নবায়ণযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর প্রচার-প্রসারে ভারত বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিয়েছে। দেশটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করেছে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫০ গিগাওয়াট পুনর্নবায়ণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা অর্জনের জন্য উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

দুই. বনায়ন এবং সংরক্ষণ : ভারত বনভূমি বৃদ্ধি এবং বন উজাড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উচ্চাভিলাষী বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রিন ইন্ডিয়া মিশনের মতো উদ্যোগের লক্ষ্য পারিবেশিক স্থিতিশীলতা বাড়ানো এবং অবক্ষয়িত বনভূমি পুনরুদ্ধার করা।

তিন. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন : ভারত তার কার্বন নিঃসরণের তীব্রতা কমাতে এবং অ-জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে তার ভূমিকা সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় ভারতের সম্পৃক্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুকূলে তার দৃঢ় মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। দেশটি প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', 'জল জীবন', এবং 'নমামি গঙ্গে'-এর মতো বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাগশিপ স্কিমও চালু করেছে। (ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (NMCG), গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন, ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (NAPCC), ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি অ্যাকশন প্ল্যান (NBAP) এবং ন্যাশনাল মিশন অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড হিউম্যান ওয়েলবিয়িং (NMBHW) এদের মধ্যে অন্যতম।

চার. বিশুদ্ধ জল এবং স্যানিটেশন : ভারত বিশুদ্ধ জল এবং স্যানিটেশন সুবিধার সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দূষণ ও দূষণ থেকে জল সম্পদ রক্ষা করার জন্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

পাঁচ. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ : ভারত জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এই উদ্যোগগুলো ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ করে এবং বিপন্ন প্রজাতিকে রক্ষা করে।

ছয়. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : ভারত বর্জ্য দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রোগ্রামগুলোতে মনোনিবেশ করেছে।

সাত. টেকসই কৃষি : টেকসই কৃষি অনুশীলন, জৈব সারের প্রচার, এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছে ভারত।

আট. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : বৈশ্বিক পরিবেশগত ফোরামের একজন মূল অংশগ্রহণকারী হিসেবে, ভারত আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত।

নয়. জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা : ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার কৌশলগুলো তৈরি করেছে। উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য ঝুঁকি হ্রাস করা এবং অভিযোজনের ক্ষমতা তৈরি করা।

দশ. জনসচেতনতা এবং শিক্ষা : ভারত পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে পাবলিক প্রচারাভিযান এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালিয়েছে।

এছাড়াও ভারত বিভিন্ন বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি এবং ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে, যেমন জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC), জীববৈচিত্র্যসংক্রান্ত কনভেনশন (CBD), জাতিসংঘের মরুকরণ প্রতিরোধসংক্রান্ত কনভেনশন (UNCCD), জলাভূমি সম্পর্কিত রামসার কনভেনশন, বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

কনভেনশন (CITES), ওজোন স্তরকে ক্ষয়কারী পদার্থের ওপর মন্ট্রিল প্রোটোকল, বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের নিষ্পত্তিসংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন, স্টকহোম কনভেনশন অন পারসিস্টেন্ট অর্গানিক পলিউট্যান্টস (POP), মিনামাটা কনভেনশন অন মার্কারি, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA) এবং কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (CDRI)। ২০১২ সালে হায়দ্রাবাদে CBD-এর COP-11, ২০১৯ সালে নয়াদিল্লিতে UNCCD-এর COP-14 এবং ২০১৮ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মতো বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলো আয়োজনের মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মসূচি যেমন লাইন অফ ক্রেডিট (এলওসি), অনুদান, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগত প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য টেকসই করার জন্যে আরো কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? পরিবেশগত সমস্যাগুলোর ওপর বৈশ্বিক এজেন্ডা গঠন করার এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্যকে টেকসই করার উপযোগী পলিসি গ্রহণের সুযোগ জি-টোয়েন্টি-এর সভাপতি হিসেবে ভারতের রয়েছে। সম্ভাব্য যে সকল পদক্ষেপ ভারত গ্রহণ করতে পারে তা নিম্নরূপ : প্রথমত, জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের (বিশেষ করে প্রধান কার্বন নির্গমনকারীদের) উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তৎপরতা বৃদ্ধি করা, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পারতপক্ষে ১.৫-এর নিচে সীমিত রাখা, যেমনটি প্রাক শিল্পায়নের কালে ছিল। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জলবায়ুর অভিঘাত প্রশমন এবং অভিযোজন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য এবং জলবায়ু প্রভাবের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং সক্ষমতা সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, বিদ্যমান পৃথিবীকে একটি স্বল্প-কার্বন, সবুজ এবং বৃত্তাকার অর্থনীতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, যা বর্জ্য হ্রাস করে, সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশগত চাপ হ্রাস করে, কর্মসম্পাদনের সুযোগ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে। চতুর্থত, নবায়নযোগ্য শক্তি, শক্তি দক্ষতা, পরিচ্ছন্ন পরিবহন, সবুজ অবকাঠামো, টেকসই কৃষি ও বনায়ন এবং জলবায়ু সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারে এমন খাতে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানো। পঞ্চমত, জীববৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং টেকসই ব্যবহার উন্নততর করা, বিশেষ করে যেগুলো জল, খাদ্য, স্বাস্থ্য, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মতো অপরিহার্য পরিষেবা প্রদান করে। ষষ্ঠত, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্প্রীতি বিনির্মাণের যে বৈশ্বিক অভিলক্ষ্য গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্যে এয়াটি বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য রূপরেখা তৈরি করা। সপ্তমত, ভূমির অবক্ষয় এবং মরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা অর্জন করা, যাতে ২০১৯ সালে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত UNCCD-এর COP-14-G সম্মত হয়েছে। অষ্টমত, একটি টেকসই এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক সুনীল অর্থনীতির কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য মহাসাগর, সমুদ্র, উপকূল এবং অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। নবমত, ইস্পাত এবং জৈব-বর্জ্যের মতো বিভিন্ন সেক্টরে সম্পদ দক্ষতা (resource efficiency) এবং বৃত্তাকার অর্থনীতিকে উৎসাহিত করা এবং বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনঃব্যবহার বাড়াতে বর্ধিত উৎপাদক দায়িত্ব এবং ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করা। দশমত, সম্পদ দক্ষতা এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির জন্য একটি জি-টোয়েন্টি শিল্প জোট প্রতিষ্ঠা করা, যা ব্যবসা, সরকার, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলন, মান, নীতি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতার সুবিধা দিতে পারে। একাদশ, G20-এর অধীনে একটি বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থ সংস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা যা সরকারি ও বেসরকারি তহবিল একত্রিত করে, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগিয়ে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কাম্য জলবায়ু সংরক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে।

ভারতের এ-২০ প্রেসিডেন্সি বৈশ্বিক পরিবেশগত এজেন্ডার জন্য একটি মাইলফলক হতে পারে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সুসামঞ্জস এবং টেকসই বিশ্ব বিনির্মাণের জন্যে ভারত তার বিপুল অভিজ্ঞতা, বহুমাত্রিক কর্মকৌশল, প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি এবং চৌকশ নেতৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে। ভারতের সফল পৌরোহিত্য অন্যান্য দেশকেও অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং সবার জন্যে একটি মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। •

ড. রাশিদ আসকারী
কলামিস্ট, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং প্রাক্তন উপাচার্য, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদরচনা

জি-টোয়েন্টি ও সম্ভাব্য আলোকরেখা

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

ইন্দোনেশিয়ার পরে জি-টোয়েন্টি বা গ্রুপ অফ টোয়েনটি ফোরামের সভাপতিত্বের দায়িত্ব ভারতের কাঁধে ন্যস্ত হওয়া সত্যিই একটা বড় ব্যাপার, গর্বের এবং দায়িত্বেরও বটে। এ-বিষয়ে ভারত সরকার তো বটেই; দেশের অন্যান্য বিরোধী দল, বাণিজ্যমহল, কর্পোরেট সেক্টর এবং জনসাধারণেরও রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষার কৌতূহল। বিশ্বের ১৯টি দেশ এবং ইওরোপীয় ইউনিয়ন এই জি-টোয়েন্টি-এর সদস্য। উল্লেখ করার মতো বিষয় এই, জি-টোয়েন্টি-এর সদস্য দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ এবং বিশ্বের জিডিপির ৮৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও বলা হয় তারা বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের দাবিদার, কিন্তু এই সংখ্যার আনুপাতিক হার প্রধানত স্থির থাকে না, ফলে এটা যে দুই তৃতীয়াংশই, তা জোর করে বলা যায় না। জি-টোয়েন্টি-এর সদস্য কোন কোন দেশ, এই আলোচনায় তা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা, সকলেই এটা জানেন। এও জানেন যে, এটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর ফোরাম

এবং এরা প্রধানত বৃহত্তর ম্যাক্রোইকনোমিক ইস্যুতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কাজ করে। এ-ছাড়াও যে অ্যাজেন্ডা এর সঙ্গে জুড়ে থাকে কিংবা রাখা হয়, সেগুলো হলো বাণিজ্য, পরিবর্তনশীল আবহাওয়া, দুর্নীতিরোধ, পরিবেশ, শক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শারীরিক পুষ্টিগত উন্নতি।

২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ভারত এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দেশের ৩২টি শহরে ২০০টিরও বেশি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ভারত। তা সাড়ম্বরে শুরুও হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, জি-টোয়েন্টি-এর প্রেসিডেন্ট দেশ হিসেবে তাদের অগ্রাধিকার হবে উপরিলিখিত কর্মসূচিগুলো। তবে এর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং-সংক্রান্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষে ভারতের কাজ করতে সুবিধা হবে। যাতে দেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও অবস্থানগত সুযোগ দৃঢ় হবে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। জি-টোয়েন্টি-এর সভাপতি হিসেবে গ্লোবাল গভর্নেন্সে প্রভাব ফেলতে দেশ সক্ষম হবে। কেননা, নতুন আন্তর্জাতিক নিয়ম প্রবর্তন করতে এবং তার মান উন্নয়ন করার সুযোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং কৌশলগত গুরুত্ব নিশ্চিতভাবে বাড়ার সুযোগ আছে। আসলে জি-টোয়েন্টি-এর যে-অ্যাজেন্ডা রয়েছে, সেগুলোর সার্বিক উন্নতি করার একটা সুযোগ ভারত যে পেয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পাশাপাশি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য যে নয়টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। বাকি দেশগুলো হলো–স্পেন, সিঙ্গাপুর, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, নেদারল্যান্ড, মরিশাস, নাইজেরিয়া এবং মিশর।

বসুধৈব কুটুম্বকম মন্ত্র এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতির ওপর ভর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশকে বিশ্বগুরুতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর ভাষণে যা জানিয়েছেন, তার মোদ্দা কথা এই–আমাদের লক্ষ্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিশ্ব বলে কিছু থাকবে না, শুধু একটি বিশ্বই হবে, যেখানে সকলের সবরকমের উন্নতিই হবে কাম্য, বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। প্রতিটি দেশের স্বতন্ত্র পরিচয় থাকলেও বিশ্বের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ–এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে সবাইকে। তো এর চেয়ে ভালো কথা আর হয় না। বিশেষত যেখানে বাংলাদেশ এবং ভারতের চিরকালীন যৌথ সহযোগিতার প্রশ্নটি রয়েছে।

২.

আমরা একটু আগেই জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে বিশেষভাবে এবারের আমন্ত্রিত বাংলাদেশের উল্লেখ করেছি। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে দুই দেশের সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা থাকতেই পারে যে, বাংলাদেশ কেন জি-টোয়েন্টি এর সদস্য দেশ নয়? প্রশ্ন থাকে, সৌদি আরব, চিন বা তুরস্ক জি-টোয়েন্টি-এর সদস্য দেশ হয়েও যেখানে জি-টোয়েন্টি-এর বৈঠক বয়কট করতে পারে, সেখানে একটি স্থিতিশীল বাজার অর্থনীতির দেশ হয়েও বাংলাদেশের কথা কেন ভাবা হবে না? এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা আশা করব আগামীদিনে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করে জি-টোয়েন্টি গোষ্ঠী জি ২১-তে পরিণত হবে। কেননা, এই জাতীয় রদবদলের ইতিহাস আছে। যেমন জি ৭ গোষ্ঠী। আগে এটা জি ৮ ছিল, অন্যায়ভাবে ক্রিমিয়া দখল করার পর রাশিয়াকে বাদ দেওয়া হয়, ফলে গ্রুপটি জি ৭ নামে পরিচিত হয়। আবার ২০২০ সালে ইওরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসে ব্রিটেন। যদিও তার কারণ অন্য, কিন্তু, এরকম উদাহরণ আরও আছে। যাই হোক, আমন্ত্রিত নয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, এর মধ্যে বাংলাদেশই ভারতের একমাত্র প্রতিবেশী দেশ শুধু নয়; দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, যে দেশটি এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত। ফলে দুই দেশেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক ছাড়াও অনেকরকমের স্বার্থ রয়েছে। পাঠকের মনে থাকতে পারে, উদ্বাস্তু সমস্যার সময় ভারতে শরণার্থীদের আশ্রয় এবং পুনর্বাসন প্রসঙ্গে তৎকালীন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা। সেই হৃদ্যতার সম্পর্ক আজও মানুষ অনুভব করে যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৯-১০ সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। শুধু তাই নয়; গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রমেই দৃঢ় হয়েছে। রাজনৈতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি পারস্পরিক নির্ভরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও আর্থিক পরিস্থিতি বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চেষ্টা করি।

জি-টোয়েন্টি প্রধানত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক সম্পর্কজনিত সহযোগিতামূলক গোষ্ঠী। সেক্ষেত্রে আর্থিক বৃদ্ধি সবচেয়ে জরুরি বিষয়। ভারতের ক্ষেত্রে কোভিড পরবর্তীকালে দেশের জিডিপি অথবা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিকে একবার তাকালে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেশের অর্থব্যবস্থার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখি। এটা একটু আশ্চর্যেরই বটে; কেননা, পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার

৭.২ শতাংশ। অথচ, আইএমএফ-এর আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থাসংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে, ২০২২ সালে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে তা কমে হবে ২.৮ শতাংশ। কিন্তু হলো ৭.২? এ তো আশাতীত! সমালোচনা হতেই পারে, শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধির প্রসঙ্গও আসতে পারে, কিন্তু এই ৭.২ শতাংশ তো অস্বীকার করা যায় না। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওই ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮.১৫ শতাংশ। কিন্তু ২০২১-২২-এ ছিল ভারতের মতোই ৭.২ শতাংশ। আমাদের মাথায় রাখা দরকার, ২০২০ সালে শুরু হওয়া কোভিড এবং তৎপরবর্তী লকডাউন। যেখানে গোটা বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। এখানে আরও একটি আশ্চর্য করে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান, যে, শুধু পদ্মাসেতু তৈরির ফলেই বাংলাদেশের জিডিপি ১.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন মনে করা হয়। পরিসংখ্যানটি একটি দেশের মোট আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই। এতৎসত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারই সার্বিক উন্নতির একমাত্র মানদণ্ড নয়। আমাদের দেশ বা বিশ্ব যেখানেই হোক, অর্থব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রে একই হারে বৃদ্ধি হয় না। কেননা, উন্নত দেশের প্রথম শর্ত কিন্তু শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধি, তাকেই আর্থিক বৃদ্ধির প্রথম সোপান বলে ভাবা হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলাদেশের বাজার অর্থনীতি গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম। কী করে এটা হতে পারে তা অনেকের কাছেই আশ্চর্যের। এই প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে, ২০১৯ সালের হিসাব মতো বাংলাদেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম ভারতের চেয়ে বেশি। সেই ভিত্তিতে আজ, এই ২০২৩ সালে তা যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। এইখানে উন্নয়নের একটা প্রসঙ্গ আসতে পারে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নকে অর্থনীতির পরিভাষায় কসমেটিক ডেভলপমেন্ট বলে। কিন্তু পদ্মাসেতুও মূলত একটি বৃহৎ রাস্তা। যা তৈরি হওয়ার পর দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপি-র ১.২৩ শতাংশ বৃদ্ধির মতো ঘটনা ঘটে, তাকে আর যাই হোক, কসমেটিক ডেভলপমেন্ট বলা যায় না।

ভারতের মতো বাংলাদেশও কৃষিপ্রধান দেশ। আইএমএফ-এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ মানুষের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। দেশের শ্রমশক্তি জরিপের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৪৫.৭ শতাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এটা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, বাংলাদেশের মোট জিডিপির ১৬ শতাংশ আসে গারমেন্টস ইনডাস্ট্রি থেকে। ফলে সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই মুহূর্তে কৃষির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পোশাকশিল্প। প্রসঙ্গত, ১৯৬০ সালে রিয়াজ গারমেন্টস নামে একটি কোম্পানি বাংলাদেশে যে বস্ত্রশিল্পের সূচনা করেছিল, তা আজ বিভিন্ন কোম্পানির হাত ধরে বহুধাবিস্তৃত। রিয়াজ গারমেন্টস-এর পরে ১৯৮০ সালের কাছাকাছি দেশ গারমেন্টস লিমিটেড ছিল বাংলাদেশের প্রথম গারমেন্টস এক্সপোর্ট কোম্পানি। এরপর যদি নাম করা যায় তাহলে এই মুহূর্তে নোমান গ্রুপ, পলমল গ্রুপ, মাইক্রোফাইবার গ্রুপ, পানাম গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, এনভয় গ্রুপ এরকম বেশ কিছু গারমেন্টস কোম্পানি বাংলাদেশে উৎপাদিত পোশাকের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ এক্সপোর্ট করে। এটা ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশের পক্ষে মেজর অ্যাচিভমেন্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে পোশাকশিল্প বাংলাদেশে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি অভিবাসন ক্ষেত্র বা রেমিট্যান্সও বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস। একটা পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে। ২০২০ সালে গোটা বিশ্বে কোভিড পরিস্থিতি এবং আর্থিক মন্দার বাজারেও রেমিট্যান্সে বাংলাদেশের আয় ছিল ২৫০০ আমেরিকান ডলার, মানে প্রায় ২৫ শতাংশ রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টা ভাবারই বটে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত করার লক্ষে জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ করা যথেষ্ট ইতিবাচক ও গভীর পদক্ষেপ। তবে এটা মানতেই হবে যে, দেশটি একটি নিম্ন-মধ্য আয়ের উন্নতিশীল দেশ। এখানে বৈদেশিক আয়ের নির্ভরতা কমেছে, একথা জোর দিয়ে বলা না-গেলেও এখনও দারিদ্র্য রয়েছে, রয়েছে বেকারত্ব। কিন্তু কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ ওই বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমে যাওয়াটাকে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে দেখতে চান। কেননা, তাঁরা মনে করেন দেশে স্বনির্ভরতার প্রসার না-ঘটলে এটা হতে পারে না। এসব সত্ত্বেও একটা স্থিতিশীল বাজার অর্থনীতির প্রশ্নে বাংলাদেশকে অনেক দেশের থেকেই গুরুত্ব দিতে হয়। এটা ভারত জানে, জি-টোয়েন্টি গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশও জানে। ফলে বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেওয়ার তাৎপর্য অনেক দিক থেকেই রয়েছে।

এখানে অন্য একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমান বিশ্ব নানা সংকট, সন্ত্রাস ও নানা অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন বহুকাল ধরেই। তার জন্য বিভিন্ন সময়ে গোটা বিশ্বে অনেক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, হচ্ছে। বাংলাদেশসহ ভারতের গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল নানা কারণেই উপদ্রুত। এই এলাকায় নিরাপত্তার প্রশ্নে সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। তা আজ নয়; অনেককাল আগে থেকেই। জি-টোয়েন্টি গোষ্ঠীর যে-অ্যাজেন্ডা আছে, তাতে বিশ্বে শান্তিরক্ষার প্রশ্নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ। ফলে বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে নানা চুক্তি হয়েছে। জি-টোয়েন্টি-এর সভাপতি হিসেবে ভারতের অন্যতম দায়িত্ব হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করা। যাতে দুই দেশেরই বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা হয়। সুযোগ এসেছে, তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে, এখন এ আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি। •

অরুণাংশু ভট্টাচার্য
কবি ও সাংবাদিক

প্রচ্ছদরচনা

জি-টোয়েন্টির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

দেবব্রত চক্রবর্তী

'গ্লোবাল ভিলেজ' কনসেপ্ট কিংবা 'বিশ্বগ্রাম'-এর ধারণা নিয়ে বর্তমান বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। বললে অত্যুক্তি হবে না, এ অঙ্গীকার এখন শুধু ধারণায়ই সীমাবদ্ধ নয়, দৃশ্যমান বাস্তবতাও বটে। আমরা দেখছি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অথবা খণ্ড খণ্ডভাবে দেখলেও বিভিন্ন মহাদেশের দেশগুলোর সমন্বয়ে বিভিন্নরকম জোট কিংবা ফোরাম গড়ে উঠছে সুনির্দিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জন কিংবা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উন্নয়নের উদ্দেশে। জি-টোয়েন্টি এরই একটি অংশ বলা যায়। ২০টি দেশের আন্তসরকারি ফোরাম, বিশ্ব উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির সমন্বিত অগ্রগতির লক্ষ্যে এ জোট গঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। জোটবদ্ধ সদস্য দেশগুলোর আনুষ্ঠানিক সম্মেলন শুরু হয় ২০০৬ সালে। বিশ্বের শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে নানামুখী সম্পর্কের প্রধানত অর্থনৈতিক সম্পর্কের সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ জোটটি বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আলোচনা-পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ভূরাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম শক্তি, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নসহ শান্তির পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভারতের প্রত্যয়ের প্রতি জি-টোয়েন্টিভুক্ত দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের অনেকেই খোলাখুলিভাবে তাদের ইতিবাচক অবস্থান ও সহযোগিতার কথা বলেছেন। বিশ্বব্যাপী যে চলমান অর্থনৈতিক সংকট যে বৈরী ছায়া ফেলেছে, এ ব্যাপারে জি-টোয়েন্টি-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ভূমিকা আরও মজবুত করতে পারে ভারতের দৃঢ় অবস্থান

জি-টোয়েন্টি-এর গত সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী সভাপতি হিসেবে ভারতকে বেছে নেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ভারত দায়িত্ব পালন করছে এবং ২০২৩ সালে অর্থাৎ চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত।

এশিয়ার উন্নয়ন-অগ্রগতির তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারতের সার্বিক অবস্থান এখন কতটা সুসংহত এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন করে নিষ্প্রয়োজন। 'বসুবৈধ কুটুম্বকম' বা 'এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'– এ স্লোগান ধারণ করে জি-টোয়েন্টি-এর এবারের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত গোষ্ঠীবদ্ধ সম্পর্কের জোরদার ভিত্তিস্থাপনে কতটা ভূমিকা রাখবে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হবে এ আলোচনা আরও আগেই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ জি-টোয়েন্টি-এর সদস্য না হলেও এবারের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত সদস্য দেশগুলোর বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ৯টি দেশকে 'গেস্ট কান্ট্রি' হিসেবে কিংবা বলা যায় 'অতিথি দেশ' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু ভারতের দিক থেকে সম্পর্ক সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে নতুন করে প্রসারিত বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে ভারত তথা নরেন্দ্র মোদি সরকার সৌহার্দের আরেকটি বর্ণিল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন জি-টোয়েন্টিভুক্ত। এ জোটের প্রায় সব দেশই অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নে নানাভাবে সমৃদ্ধ, তা আমাদের অজানা নয়। জি-টোয়েন্টি এমন একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কো-অপারেশন শক্তি যেখানে বিশ্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ জিডিপি রয়েছে। এ চিত্র জি-টোয়েন্টি-এর গুরুত্বটা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে দেয়। বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর লক্ষ্যেই গঠিত হয় জি-টোয়েন্টি। বৈশ্বিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন-প্রশমন এবং উন্নয়ন এ বিষয়গুলো নিয়ে এ জোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং নির্মিত হয় ভবিষ্যতের পথ। শুরু থেকেই ভারত এ জোটের অন্যতম অংশীদার।

এবারের শীর্ষ সম্মেলন এমন এক সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যখন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বলতে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাশিয়া-ইউক্রেন চলমান যুদ্ধের বহুমুখী বিরূপ প্রভাব বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট দৃশ্যমান। আমরা দেখছি, দেশে দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ছায়া এ যুদ্ধ প্রলম্বিত করেছে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে এর অভিঘাত লেগেছে। বিশেষ করে দেশে দেশে মূল্যস্ফীতির বিরূপ প্রভাব জনজীবনে বৈরী ছায়া ফেলেছে। এমন পরিস্থিতিতে এবারের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারতের ভূমিকা এবং কার্যক্ষেত্রে সক্ষমতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন দেশ তো বটেই, এমনকি বিশ্ব অর্থনীতির গবেষক-পর্যালোচকদের গবেষণায় সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ভারত যেহেতু এর নেতৃত্ব দিচ্ছে তাই দেশটির সামনে অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সমৃদ্ধি, ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো মজবুত করা, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ, খাদ্য ও শক্তির সুরক্ষা–এ বিষয়গুলো বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়গুলো তুলে ধরার পাশাপাশি জোটে ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব যদি দূরদর্শী প্রতিভাত হয় তাহলে আগামী বিশ্বে কী হতে চলেছে এর একটি সার্বিক চিত্র তৈরি করা সম্ভব। আধুনিক বিশ্বসভ্যতা ক্রমবিকাশের পথে এখন প্রতিটি দেশেরই বৈদেশিক নীতির কৌশল বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অবস্থান যার যার মতো করে সুসংহত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা দেখছি, নরেন্দ্র মোদি সরকার বিকাশের নানামুখী প্রয়োজনীয়তা নৈতিক, সামাজিক সচেতনতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। আমাদের স্মরণে আছে, জি-টোয়েন্টিভুক্ত দেশগুলোর সভাপতি হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্বভার গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'এ দায়িত্ব প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাছে গর্বের-সম্মানের। ভারতের লক্ষ্য হবে, জি-টোয়েন্টি দেশগুলোর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়া।' উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের সাবেক অর্থমন্ত্রী জিম ও'নিল ২০১৯ সালে তার এক নিবন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, জি-টোয়েন্টি এখনও প্রাসঙ্গিক কি না। তবে একই সঙ্গে তিনি তার একটি নিবন্ধে এও লিখেছিলেন, 'জি-টোয়েন্টি-এর প্রাথমিক অর্জনের প্রশংসা যারা করেছিলেন আমি অবশ্যই তাদের একজন। ২০০১ সালের পর থেকে যখন আমি ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন) উত্থান লক্ষ করেছি, তখন থেকেই আমি বিশ্ব শাসন কাঠামোগুলোর পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বলে আসছি, জি৭-এর মতো আরও ফোরাম দরকার 'তার এ বক্তব্যের চার বছর অতিক্রান্তেও বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমান বিশ্বের সামনে অন্যতম সংকট যা প্রতীয়মান হচ্ছে তা হলো অর্থনৈতিক। এ বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য যূথবদ্ধ প্রয়াসের বিকল্প নেই। বিশ্বব্যাপী সামাজিক অসমতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে জি-টোয়েন্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শুধু অর্থনৈতিক নীতির নির্যাস বাস্তবায়নই যাতে মূল লক্ষ্য না হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে শক্তিশালী দেশ ভারতের বিশেষ ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে।

গ্লোবাল সাউথ হিসেবে পরিচিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন সংকট তুলে ধরতে চাচ্ছে ভারত। নয়াদিল্লিতে জি-টোয়েন্টি-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ বড়পর্দায় সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং বিভেদ ভুলে উন্নয়নশীল বিশ্বের সংকট সমাধানের দিকে নজর দিতে জি-টোয়েন্টিভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, বর্তমান বিশ্ব যখন গভীরভাবে বিভাজন ও নানামুখী সংকটে নিপতিত তখন ভারতের তরফে ঘোষিত দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে অঙ্গীকার ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে যেমন ইতিবাচক বার্তা দেয়, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের পথও প্রশস্ত করে। এ বাস্তবতায় অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আশার ক্ষেত্র সঙ্গতই বিস্তৃত হচ্ছে। অনস্বীকার্য, সম্ভাবনার দ্বার যেখানে উন্মুক্ত সেখানে দূরদর্শী নেতৃত্বের ইতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে তা-ও প্রত্যাশাযুক্ত। বিদ্যমান বিশ্ববাস্তবতায় সঙ্গতই প্রশ্ন উঠেছে, মানবিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে কী ধরনের সমাজ গড়তে চান বিশ্বনেতৃত্ব? নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদির চিন্তা এবং ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দর্শন সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিশ্বে ভারত অন্যতম শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এখন আরও অনেক বেশি মূল্যায়িত। গণতন্ত্রের ধারক ও পরিচর্যাকারী হিসেবে ভারতের জাতীয় সচেতনতা উদার নৈতিকতার দ্বারা চালিত এবং একই সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠের সমন্বয়ে উচ্চারিত। মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও উন্নতির জন্য বর্তমান বিশ্বে নানা রকম সম্পর্কের সেতু মজবুতকরণের বিষয়টি জোরালো হয়ে উঠেছে। এ বাস্তবতায় বিশ্বের অঞ্চলভিত্তিক কিংবা আরও বৃহৎ পরিসরে মানবকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের অধিকতর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনে জি-টোয়েন্টি-এর ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জি-টোয়েন্টি এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তি ও কর্মভিত্তিক সিদ্ধান্তমূলক সুদূরপ্রসারী ভাবনার প্রতিফলন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে এবং তাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টি আরও বেশি আশান্বিত করছে।

জি-টোয়েন্টি-এর দায়িত্ব নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তি ও উন্নতির লক্ষ্যে

লড়াইয়ে জেতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সন্দেহ নেই, বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সংগঠন জি-টোয়েন্টি-এর সভাপতি হিসেবে ভারতের পথচলা এবং 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'–এ স্লোগান নিছকই যে স্লোগান নয়, এর প্রমাণে এখন ভারতের সামনে যে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তা মোকাবিলা করা দুরূহ নয় বলে মনে করি। কারণ ভূরাজনৈতিক সম্পর্কের মেরুকরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমীকরণের বিষয়গুলোও ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। অস্বীকার করা যাবে না, বর্তমান বিশ্বে মেরুকরণের যে সমীকরণ চলছে এর মূল এজেন্ডায় দৃশ্য-অদৃশ্যভাবে রয়েছে অর্থনীতি। পৃথিবী নামক এ গ্রহের নানা উপসর্গের নিরসন করে স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রায় উৎসাহ জোগানোর প্রত্যয়ও সুস্পষ্ট হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি নিবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন, 'মানব পরিবারে সমন্বয় প্রচারের জন্য আমরা খাদ্য, সার ও ওষুধের বৈশ্বিক সরবরাহ রাজনীতিমুক্ত করব, যাতে ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ মানবিক সংকটে পরিণত না হয়। যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তারাই আমাদের চিন্তাভাবনায় অগ্রাধিকার পাবে। ঠিক যেমন একটা পরিবারে হয়ে থাকে। সংগঠনের অগ্রাধিকারগুলো শুধু শরিকদের সঙ্গেই আলোচনা করে গঠিত হবে না, দক্ষিণ গোলার্ধের সহযাত্রীদের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে, যাদের কণ্ঠস্বর প্রায়ই অশ্রুত থাকে।' তার এ প্রত্যয়ের প্রতিফলন ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশসহ ৯টি দেশকে 'গেস্ট কান্ট্রি' অথবা 'অতিথি দেশ' হিসেবে আমন্ত্রণ এরই অংশ বলা যায়। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত গত জি-টোয়েন্টি সম্মেলন চলাকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলাপে নরেন্দ্র মোদি যথার্থই বলেছিলেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতির উপায় সবাইকেই খুঁজতে হবে। সেই দায়িত্ব আজ আমাদের প্রত্যেকের ওপর বর্তাচ্ছে। এটা যুদ্ধের সময় নয়। কূটনীতির রাস্তায় কী করে ফেরা যায় তার খোঁজে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।' তার এ আহ্বান নিঃসন্দেহে দূরদর্শী এবং এটি সত্য, শান্তির বলয় নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো অগ্রগতিই সম্ভব হবে না এবং সম্ভাবনার বাস্তবায়ন দুরূহ। বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি জ্বালানি ও খাদ্য সংকটের পূর্বাভাস বিশ্বকে চোখ রাঙাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সম্পর্কের জোরদারকরণের মধ্য দিয়ে সম্ভাবনার বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। ইতোমধ্যে আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে যে প্রত্যয়ের কথা শুনেছি, এর বাস্তবায়নের পথ যদি যূথবদ্ধ প্রচেষ্টায় মসৃণ হয় তাহলে সংকটের ছায়া সরে যাবে, এও অবাস্তব কিছু নয়। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দ্বিধাহীনভাবেই এটুকু বলা যায়, সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গতিশীলকরণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং এর ইতিবাচক ফল পাওয়ার আশা অমূলক নয়।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নসহ শান্তির পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভারতের প্রত্যয়ের প্রতি জি-টোয়েন্টিভুক্ত দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের অনেকেই খোলাখুলিভাবে তাদের ইতিবাচক অবস্থান ও সহযোগিতার কথা বলেছেন। বিশ্বব্যাপী যে চলমান অর্থনৈতিক সংকট যে বৈরী ছায়া ফেলেছে, এ ব্যাপারে জি-টোয়েন্টি-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ভূমিকা আরও মজবুত করতে পারে ভারতের দৃঢ় অবস্থান। জি-টোয়েন্টি আগামী শীর্ষ সম্মেলনকে পরিবর্তন-অগ্রগতির মূলমঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং একে ঘিরে ব্যাপক প্রত্যাশার পরিসরও বিস্তৃত হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি চাঙা করার জন্য প্রয়োজন সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা। এ ক্ষেত্রে ভারতের দায়িত্বশীল ভাবমূর্তি সবল ভূমিকা রাখবে এও প্রত্যাশা। ভারতের জি-টোয়েন্টি-এর প্রেসিডেন্সির অফিশিয়াল এজেন্ডায় আছে দরিদ্র দেশগুলোর চাহিদার ওপর জোর দেওয়া, অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, জলবায়ু পরিবর্তনে অর্থায়ন ও গণপ্রতিনিধিত্বমূলক বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রগতি সাধন। ভারতের এজেন্ডাগুলো নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কারণ পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট অনেকের ভাবনায়ই নবজাগরণ ঘটিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে জি-টোয়েন্টি বা গ্রুপ অব টোয়েন্টিকে শক্তিশালী সংগঠন ও কার্যকর গ্লোবাল গভর্নেন্স ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করার কারণ নিঃসন্দেহে যৌক্তিক।

বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান মন্দাঝুঁকি, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণসংকট এবং বাণিজ্য ও প্রযুক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ যতটা মসৃণ করা সম্ভব হবে জি-টোয়েন্টি-এর মূল লক্ষ্য একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন তত সহজ হবে। ভারত একটি দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনৈতিক অগ্রগতির দেশ। 'এক পৃথিবী'র নিরাময়সাধন, 'এক পৃথিবী'র মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধ মজবুত করার পাশাপাশি 'এক ভবিষ্যৎ' গড়ার প্রত্যয় যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে নিঃসন্দেহে সম্ভাবনার আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং এর সুফলভোগী হবে সবাই। বিশ্বস্ততার প্রতি ভারতের ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রায় উৎসাহ জোগানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আন্তরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি থাকবে না–বাংলাদেশের তরফে এ প্রতিশ্রুতি ইতোপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। ভূরাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাপান-উতর এবং ম্যাক্রো ইকোনমির স্থিতিশীলতার জন্য জি-টোয়েন্টি-এর কর্মসূচি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। •

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ কবি ও গল্পকার
সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুলাই

উত্তমকুমার

০১ জুলাই ১৮৮২ ❖ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
০১ জুলাই ১৯৬২ ❖ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
০৪ জুলাই ১৯০২ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু বেলুড় মঠে
০৭ জুলাই ১৯০৫ ❖ প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম
০৮ জুলাই ১৯১৪ ❖ রাজনীতিক জ্যোতি বসুর জন্ম
০৮ জুলাই ২০০৩ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ জুলাই ১৯৩৮ ❖ অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্ম গুজরাটে
১০ জুলাই ১৯০৯ ❖ কবি বিষ্ণু দে-র জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৯৯ ❖ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৬৩ ❖ কবি-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
২০ জুলাই ১৯০২ ❖ কবি সুনির্মল বসুর জন্ম
২২ জুলাই ১৮১৪ ❖ প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২ জুলাই ১৯২৩ ❖ গায়ক মুকেশের জন্ম লুধিয়ানায়
২৪ জুলাই ১৯৮০ ❖ উত্তমকুমারের মৃত্যু
২৬ জুলাই ১৮৬৫ ❖ রজনীকান্ত সেনের জন্ম পাবনায়
৩১ জুলাই ১৮৮০ ❖ মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম

বিশ্বকে এক সুতোয় গাঁথার স্বপ্নে ভারত

মো. রেজাউল করিম

প্রচ্ছদরচনা

বিশ্বের উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে 'গ্রুপ টোয়েন্টি' বা জি-টোয়েন্টির সভাপতি হিসেবে ভারতের আবির্ভাব নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে ২০২২ সালে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের করে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত।

জি-টোয়েন্টির আসন্ন সম্মেলন ঘিরে বছরব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে একই সুতোয় গাঁথা হচ্ছে সম্ভাবনাময় দেশগুলোকে যারা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ৮৫ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পেক্ষাপটে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-টোয়েন্টির শীর্ষ সম্মেলনের মূলনীতি 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বা 'বিশ্ব এক পরিবার' খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে যখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘাত চলছে। এমন পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবাইকে এক করার প্রয়াসটা অনেক গুরুত্ব বহন করে। আসন্ন জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের মূল থিমটি মহা উপনিষদের প্রাচীন সংস্কৃত পাঠ থেকে মূলত 'সমস্ত জীবনের মূল্য–মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অণুজীব–এই পৃথিবী গ্রহে

এবং মহাবিশ্বে তাদের আন্তঃসম্পর্ককে তুলে ধরেছে।

দ্য গ্রুপ অফ টোয়েন্টি একটি ইন্টারগভার্নমেন্ট ফোরাম যার মধ্যে ১৮টি দেশ ও গোষ্ঠী রয়েছে–আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

বিশ্বের মোট দেশজ উপাদান বা জিডিপির প্রায় ৮৫ শতাংশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে প্রতিনিধিত্ব করে জি-টোয়েন্টিভুক্ত দেশগুলো।

এই শতাব্দীর প্রাক্কালে ১৯৯৯ সালে এশিয়া অঞ্চলে আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের একটি ফোরাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পাওয়া জিটোয়েন্টির ভূমিকা সামনে আসে কিছুটা পরে। যখন ২০০৭ ও ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। তখন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য 'প্রধান নীতিনির্ধারণী ফোরাম' হিসেবে ভূমিকা রাখে জিটোয়েন্টি।

সভাপতি হিসেবে জি-টোয়েন্টির সর্ববৃহৎ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে ভারত। আসন্ন সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দশটি দেশকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের প্রতিবেশীদের মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে জি-টোয়েন্টিতে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ অর্জন।

বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি অন্য দেশগুলো মিশর, মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর, স্পেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ফাইনান্সিয়াল স্টাবিলিটি বোর্ড (এফএসবি), অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি), আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপার্সন, নিউ পার্টনার্শিপ ফর আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট (নেপাডের) চেয়ারপার্সন, অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান ন্যাশন (আসিয়ানের) চেয়ারপার্সন, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আইএসএ এবং সিডিআরআই।

নয়াদিল্লি প্রায়শই ঢাকার সাথে তার ক্রমবর্ধমান সম্পর্ককে বিশ্বের অন্যান্য অংশের মডেল হিসেবে উল্লেখ করেছে, বিশেষ করে কয়েক দশক ধরে বন্ধ থাকা সংযোগগুলো পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শারীরিক সংযোগের ক্ষেত্রে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন এবং ভূমি ও আঞ্চলিক বিরোধগুলো সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাধান করা। এর বার্তাটি 'বিশ্ব এক পরিবার' থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনটি ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য বেশ গুরুত্ব বহন করছে। প্রথমত, বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিমন্ত্রণ গত এক দশকে গড়ে ওঠা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ দশকের মধ্যে সম্পর্কের 'সোনালী অধ্যায়' পার করছে দক্ষিণ এশিয়ার দুই ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষ্যানুযায়ী, ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির ভিত্তিই বাংলাদেশ।

দ্বিতীয়ত, ভারত জানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের হৃদয়ছোঁয়া গল্প। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে 'এশিয়ার উদীয়মান বাঘ' হিসেবে। আমেরিকার বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বর্তমান মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপির প্রবৃদ্ধি (কমপক্ষে ৫ শতাংশ) ধরে রাখতে পারলে ২০৪০ সালের মধ্যেই এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির মাইলফলক স্পর্শ করবে বাংলাদেশ।

আর প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ হলে ২০৩০ সালেই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব। ভারতের প্রতিবেশী নীতির ভিত্তিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির এগিয়ে চলা উপআঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য উজ্জ্বল উদাহরণ। জি-টোয়েন্টির মতো বহু-অর্থনীতির এক টেবিলে বাংলাদেশকে নিয়ে আসা অনেক বড় সম্মানের, অর্জনেরও।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এই দশকের শেষ নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হবে বাংলাদেশ। চতুর্থত, স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশুমৃত্যু রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। এ অর্জনগুলোও বাংলাদেশের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করবে। দিল্লির এই বিশ্বসম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ গণতন্ত্র ও বহুপাক্ষিকতার প্রতি ভারতের গভীর প্রতিশ্রুতির আরেকটি উদাহরণ। আসন্ন সম্মিলনীতে 'স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল' দেশের অংশগ্রহণ গ্লোবাল সাউথের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের একটি প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই 'দ্য ভয়েস অফ দ্য গ্লোবাল সাউথ' ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জি-টোয়েন্টিতে ভারতের সভাপতিত্বের ধারণা দিয়েছিলেন। জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের নেতৃত্বের 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' দিকগুলো উল্লেখ করেন তিনি।

যার মধ্যে– সকলের মঙ্গলের জন্য বাস্তবসম্মত বৈশ্বিক সমাধান খুঁজে বের করার মাধ্যমে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও গণতন্ত্রীকরণ করা। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সবুজ উন্নয়ন, জলবায়ু অর্থ, টেকসই জীবনধারা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো, একুশ শতকের বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের বিষয়গুলো এসেছে ভারতের সভাপতিত্বকালে।

ভারত সবসময় একটি বহুত্ববাদী এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের কল্পনা করেছে যেখানে দেশগুলি সম্মিলিতভাবে বিশ্বশান্তি এবং সমগ্র বিশ্বের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে। ধারণাটি ভারতের নিজস্ব বৈচিত্র্য এবং সমষ্টিবাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত।

এবছরের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে 'গ্লোবাল সাউথ সামিটে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন যে 'বিশ্ব একটি সংকটের মধ্যে রয়েছে'। ওসময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতাদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন এই বলে যে, 'আপনার কণ্ঠ ভারতের কণ্ঠস্বর' এবং 'আপনার অগ্রাধিকার ভারতের অগ্রাধিকার'। এর চেয়ে আর বড় অনুপ্রেরণা কি হতে পারে উন্নয়নশীল দেশের নেতাদের প্রতি।

নরেন্দ্র মোদি তার বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন যে ভারত উন্নয়নশীল এবং উন্নত বিশ্বের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করতে চায়। ভবিষ্যতে গ্লোবাল সাউথ নামে পরিচিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে 'সবচেয়ে বড়' অংশীদারিত্ব রয়েছে ভারতের।

ভারতের নেতা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে দেশগুলোকে গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকারের প্রতি সাড়া দিতে হবে, অভিন্ন তবে আলাদা দায়িত্বের নীতিকে স্বীকৃতি দিতে হবে, আন্তর্জাতিক আইন এবং আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বকে সম্মান করতে হবে এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সংস্কার করতে হবে। তিনি খাদ্য, জ্বালানি এবং সারের ঘাটতির বিষয়টিকেও ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এটিকে যুদ্ধ, সংঘাত, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং করোনাভাইরাস মহামারির প্রভাবকে দায়ী করেছেন।

এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনটি ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য বেশ গুরুত্ব বহন করছে। প্রথমত, বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিমন্ত্রণ গত এক দশকে গড়ে ওঠা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ দশকের মধ্যে সম্পর্কের 'সোনালী অধ্যায়' পার করছে দক্ষিণ এশিয়ার দুই ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্র

জি-টোয়েন্টির সভাপতি হিসেবে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের পাশাপাশি বছরব্যাপী আয়োজন চলে বিভিন্ন বিষয়ে। সকল আয়োজনের দুটি সমান্তরাল দিক রয়েছে, একটি ফিন্যান্স এবং অন্যটা শেরপা ট্রাক। অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা ফিন্যান্স ট্র্যাকের নেতৃত্ব দেন এবং শেরপারা শেরপা ট্র্যাকের নেতৃত্ব দেন। দুটি ট্র্যাকের মধ্যে, বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে যেখানে সদস্যদের প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত/অতিথি দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

শেরপা ট্র্যাক থেকে জি-টোয়েন্টি সদস্য দেশগুলোর সরকারের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত, যারা নেতাদের ব্যক্তিগত দূত। শেরপা ট্রাকে ১৩টি ওয়ার্কিং গ্রুপ, দুটি ইনিশিয়েটিভ–রিসার্চ ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ গ্যাদারিং এবং জি-টোয়েন্টি এমপাওয়ার এবং বিভিন্ন এনগেজমেন্ট গ্রুপের ইনপুট তত্ত্বাবধান করে। এই গ্রুপের সবাই সারা বছর মিলিত হয় এবং ইস্যু নোট এবং আলোচনার আউটপুট তৈরি করে। এসকল আলোচনা সমন্বিত রূপ পায় শেরপা বৈঠকে, যেখানে ঐকমত্যভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়।

শেরপা-পর্যায়ের বৈঠকের রেজুলেশন শীর্ষ সম্মেলনে নেতাদের ঘোষণার ভিত্তি তৈরি করে। যেমনটি হতে যাচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লি শীর্ষ সম্মেলনে, আলোচনা, বিতর্ক এবং ঐক্যমত সাপেক্ষে স্বাক্ষরিত হবে সমন্বিত ঘোষণা।

জি-টোয়েন্টি সম্মেলনের বিভিন্ন এনগেজমেন্ট গ্রুপ রয়েছে যার মধ্যে অংশগ্রহণকারি দেশের নাগরিক সমাজ, সংসদ সদস্য, নীতি গবেষক, মহিলা, যুব, শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীদের একত্র হবার সুযোগ দিচ্ছে।

এবারে প্রথমবারের মতো প্রযুক্তিভিত্তিক নবীন উদ্যোক্তাদের জি-টোয়েন্টিতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে স্টার্টআপ টোয়েন্টি এনগেজমেন্ট গ্রুপের মাধ্যমে। জি-টোয়েন্টির সভাপতি হিসেবে তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি আমরা দেখতে পাই এমন উদ্যোগে। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সাড়া দেয় এমন উদ্ভাবন চালানোর ক্ষেত্রে স্টার্টআপদের স্বীকৃত দিলো ভারত।

সকল এনগেজমেন্ট গ্রুপের কার্যপরিধির মাধ্যমে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক, সিদ্ধান্তমূলক এবং কর্মমুখী' নীতি কৌশল গঠনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা রূপরেখা আমরা গত জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে পেয়েছিলাম।

ভারতের সভাপতিত্বকালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ওপর একটি নতুন ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাতে জি-টোয়েন্টির সদস্যরাষ্ট্রের যৌথ কাজকে উৎসাহিত করা হবে গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে। আমাদের এক পৃথিবীকে সবার বাসযোগ্য রাখতে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগগুলো শেয়ার করা যাবে। আমরা লক্ষ করেছি, জি-টোয়েন্টির সভাপতি হিসেবে ভারত অন্তর্ভুক্তিমূলক আয়োজন করে যাচ্ছে বছরব্যাপী। শুধু বড় শহরগুলো নয়, ভারতের ৩২টি অঞ্চলে ৫০টির বেশি শহরে ২০০টির বেশি সভার আয়োজন করা হচ্ছে, যার ফলে বিশ্বদরবারে সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এবারের জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে ছয়টি প্রধান বিষয়কে সামনে এনেছে ভারত। যার মধ্যে প্রথমটি হলো–সবুজ উন্নয়ন, জলবায়ু অর্থায়ন এবং টেকসই জীবনধারা। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় শুধু অর্থ ও প্রযুক্তিতে নির্ভর করে নয় বরং সারা বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিরসন কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির বিপরীতে নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানিতে জোর দেওয়া হবে জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে।

বিশ্বকে 'লাইফ' নামে নতুন একটি ধারণা দেবে ভারত, যার মর্মার্থ হলো পরিবেশের জন্য জীবনধারা। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি। স্থিতিশীল উন্নয়নের মুলভিত্তি হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা। জি-টোয়েন্টি সভাপতি হিসেবে ভারতের লক্ষ্য হলো কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখা, সেটা আঞ্চলিক কিংবা বৈশ্বিক পর্যায়ে। বিশেষ করে অর্থনীতিতে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহৎ বাণিজ্য থেকে অতিক্ষুদ্র মাঝারি (এমএসএমই) উদ্যোগে সহযোগিতা বাড়ানো, শ্রম অধিকারের প্রচার এবং শ্রম কল্যাণ নিশ্চিত করা, অঞ্চলভিত্তিক দক্ষতার ব্যবধান কমানো এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক কৃষি মূল্য চেইন এবং খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নের কথা বিশ্বকে জানাবে ভারত।

তৃতীয় বিষয়টি হলো এসডিজি। ভারত এমন সময়ে জি-টোয়েন্টি সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে যখন বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন মধ্যপর্যায়ে আছে। আগামী সাত বছরের মধ্যে এসডিজির যে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তার প্রতিফলন রয়েছে এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে। করোনা মহামারির পরে অর্থনীতিগুলো যখন প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসার লড়াই করছে, সে পর্যায়ে এসডিজির সাথে মিল রেখে বিশ্বকে বাস্তবভিত্তিক পথ দেখাতে চায় ভারত।

তারপর প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর কথা বলা হচ্ছে এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে। প্রযুক্তির সম্প্রসারণের সাথে সাথে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে মানুষের কাছে সেবার পৌঁছে দেয়ার জন্য। জি-টোয়েন্টির সভাপতি হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মানুষের জ্ঞান প্রয়োগের পাশাপাশি

এবারে প্রথমবারের মতো প্রযুক্তিভিত্তিক নবীন উদ্যোক্তাদের জি-টোয়েন্টিতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে স্টার্টআপ টোয়েন্টি এনগেজমেন্ট গ্রুপের মাধ্যমে। জি-টোয়েন্টির সভাপতি হিসেবে তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি আমরা দেখতে পাই এমন উদ্যোগে। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সাড়া দেয় এমন উদ্ভাবন চালানোর ক্ষেত্রে স্টার্টআপদের স্বীকৃত দিলো ভারত

নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং কৃষি থেকে শিক্ষা পর্যন্ত সেক্টরে উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলছে ভারত।

পঞ্চম বিষয় হিসেবে একুশ শতকের বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা আসবে এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে। ভারতের অগ্রাধিকার হবে বহুপাক্ষিকতার জন্য চাপ অব্যাহত রাখা যা আরও জবাবদিহিমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক বহুমুখী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরি করে। একুশ শতকের ঝুঁকি মোকাবিলায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় নতুন কিছু সংস্কারের প্রস্তাব আসবে সভাপতি রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

এবং সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও বিকাশে জি-টোয়েন্টি কাজ করবে। এবারের ফোরামে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন তুলে ধরা হবে। যেখানে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রতিনিধিত্বের কথা জানাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলো। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নারীদের অংশগ্রহণে জোর দেওয়া হবে।

আশা করা যায় ভারতের নেতৃত্বে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় নতুন এক মাত্রা যোগ করবে এবারের জি-টোয়েন্টি সম্মেলন। যেখানে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অনেকটা সম্মানের, অর্জনের। •

মোঃ রেজাউল করিম ॥ সম্পাদক, ডেইলি সান।
সভাপতি, ডিপ্লোম্যাটিক করেসপডেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিকাব)।

প্রচ্ছদরচনা

বৈশ্বিক শান্তিরক্ষায় জি-টোয়েন্টি

নুরুল ইসলাম হাসিব

গ্রুপ অব টোয়েনটি (জি-টোয়েন্টি) বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সংগঠন বা ফোরাম। ১৯৯৯ সালে এর জন্ম একধরনের বৈশ্বিক বাস্তবতায়। এশিয়ান আর্থিক সঙ্কটের পরে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ফোরাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জি-টোয়েন্টি। ১৯টি দেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য। পরবর্তীতে এর প্রাসঙ্গিকতা আরো দৃঢ় হয়েছে ২০০৭ এর অর্থনৈতিক সংকটের পরে। আবারও বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে জি-টোয়েন্টিকে রাষ্ট্রপ্রধানদের স্তরে উন্নীত করা হয়, যা পরবর্তীতে 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম' হিসেবে মনোনীত হয়।

এবারের সামিট এমন সময় হতে যাচ্ছে যখন কোভিট-১৯ মহামারি পরবর্তী রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ধাক্কায় হিমশিম খাচ্ছে সারাবিশ্ব

এই সংকটের সময় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, আইএমএফ কিংবা বিশ্ব ব্যাংকের ব্যর্থতা পরিষ্কার। খোদ জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস 'এখনকার বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে এসকল প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার কখনো হবে কিনা, সেটা নিয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। কিন্তু, গঠন ও কাঠামোগত বিবেচনায় বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের তুলনায় জি-টোয়েন্টি বেশি উপযুক্ত বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষকরা।

এখানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ সদস্য–চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র, ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির দেশ ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং তুরস্ক রয়েছে। বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ, এবং বিশ্ববাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ এই দেশগুলোর অবদান। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে এই ১৯টি দেশ।

তাই বর্তমান বাস্তবতায় জি-টোয়েন্টি নিয়ে প্রত্যাশা অনেক। বিশেষ করে মানবতার স্বার্থে যুদ্ধের সমাপ্তির দাবি করা, এবং বৈশ্বিক ঐক্য, সংহতি ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আশার কথা হলো, এবারের সভাপতি ভারত। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির প্রচার করা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তোলা, জোট নিরপেক্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা।

সভাপতি হিসেবে গত বছরের ১ ডিসেম্বর দায়িত্ব নেবার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, জি-টোয়েন্টি ঘিরে ভারতের মূল ভাবনা, 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এটি শুধু একটি স্লোগান নয়। এটি সাম্প্রতিক বাস্তবতায় এমন এক পরিস্থিতি, যা আমরা সম্মিলিতভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। আজ, আমাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট উৎপাদন করার উপায় রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ এবং মহামারিকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই চ্যালেঞ্জগুলো একে অপরের সাথে লড়াই করে নয়, শুধু একসঙ্গে কাজ করে সমাধান করা যেতে পারে।

ভারতের জি-টোয়েন্টি সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ বাংলাদেশের জন্যও গৌরব বয়ে এনেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির 'প্রতিবেশী প্রথম' এবং তার মধ্যে 'বাংলাদেশ প্রথম' নীতির আলোকে বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র দেশ, জি-টোয়েন্টিতে আমন্ত্রিত 'অতিথি' হিসেবে অংশগ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বরে সামিটে যোগদানের কথা রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বৈশ্বিক যেকোনো সংকটে বাংলাদেশের বহুপাক্ষিকতাবাদ এবং ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির আলোকে তার অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন।

মহামারির সময় তিনি যেমন টিকা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, ঠিক তেমনি যুদ্ধের বিরুদ্ধেও সোচ্চার আছেন।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, 'প্রলম্বিত যুদ্ধ এবং আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞা বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে চলেছে। যুদ্ধের প্রতিটি দিন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে এবং বিশ্বের দূরতম প্রান্তে অনেক জীবন কেড়ে নিচ্ছে এবং ধ্বংস করছে।'

বাংলাদেশ সবসময় বৈশ্বিক ঐক্য, সংহতি ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে তার প্রথম বক্তৃতায় বিশ্বশান্তি, মানবতা ও সমৃদ্ধির প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা বলেছিলেন। তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই একই নীতি অনুসরণ করে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাব আবারও গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দুটি বিষয়ে সব সময় গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, তা ভারতের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো সন্ত্রাসবাদ, আরেকটি জলবায়ু পরিবর্তন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'জিরো-টলারেন্স' নীতি বিশ্বে প্রশংসিত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তার ঘোষিত পরিকল্পনা ইতোমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে 'মডেল' হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তিনি 'জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' করেছেন, যা 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপেরিটি প্ল্যান' নামে পরিচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যেসব অঞ্চলে জীবিকার চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি, সেসব অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহাওয়ার চরমতা 'শান্তি ও নিরাপত্তার' ওপর প্রভাব ফেলে। এর ফলে সম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষতি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি বৃদ্ধি, বৈষম্য ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, যা অর্থনীতি এবং মানবকল্যাণের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

এই অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন দৃশ্যমান। বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন দেশ। একদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরেক দেশের ওপর প্রভাব ফেলে।

ভারতের সভাপতিত্বে জি-টোয়েন্টি আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তন তাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে সেটাই প্রত্যাশা।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকা মিয়ানমারের প্রায় এগারো লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন অনেকে। এই সঙ্কট সমাধানেও জি-টোয়েন্টি নেতৃবৃন্দকে উদ্যোগী হতে হবে।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে জাতিসংঘ ছিল বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সেই ব্যবস্থা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ঠেকাতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে এলো জি-সেভেন। আন্তর্জাতিক ফোকাস জি-সেভেনের দিকে সরে গেল। কিন্তু জি-সেভেনও বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলা করতে পারেনি। তৈরি হলো জি-টোয়েন্টি। কাজেই বৈশ্বিক শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে পৃথিবীর অনেক দেশ বিশেষ করে আমাদের মতো স্বল্পোন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলো তাকিয়ে আছে।

একদিকে বিশ্বব্যাপী মহামারি পরবর্তী উত্তরণ, যুদ্ধের ধাক্কা মোকাবিলা, অন্যদিকে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। তবে এই টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সহিংসতা এবং নিরাপত্তাহীনতা একটি দেশের উন্নয়নে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। তাই সংঘাত ও নিরাপত্তাহীনতার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে আহ্বান করা হয়েছে। একাজে বহুপাক্ষিকতার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে, সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য।

জি-টোয়েন্টি সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে।

কবিতার ভাষায় বললে,

'আমরা পরস্পর পরস্পরের হলে,
পৃথিবী আমাদের হবে আমরা পৃথিবীর।' •

নুরুল ইসলাম হাসিব
সাংবাদিক, ঢাকা ট্রিবিউন
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ডি আর ইউ

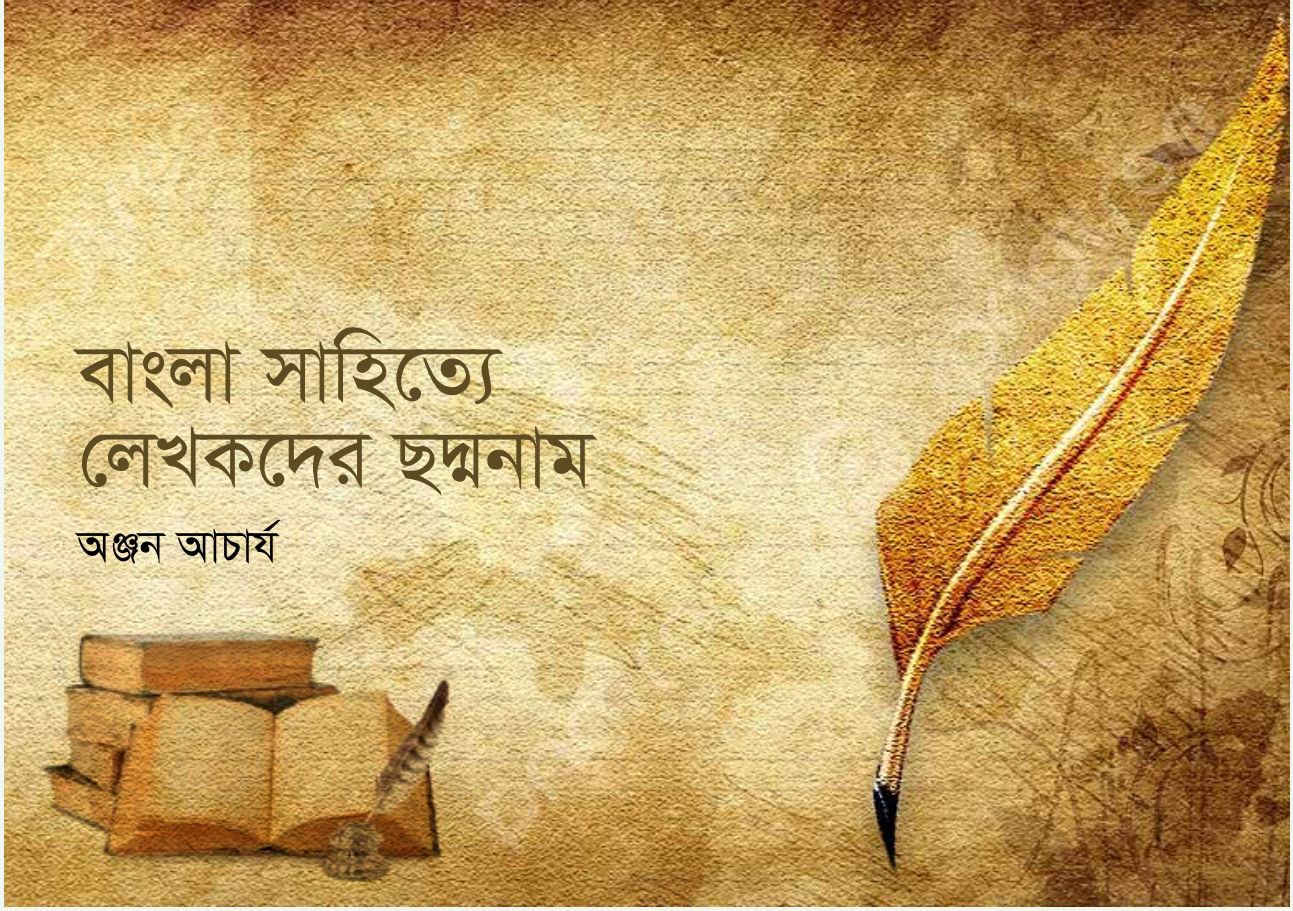

বাংলা সাহিত্যে লেখকদের ছদ্মনাম

অঞ্জন আচার্য

ফিচার

মানুষ তার জন্মগত নাম ছেড়ে ছদ্মনাম রাখে কেন? উত্তর থাকতে পারে অনেক রকম। তবে মোটা দাগে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষত ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে মানুষ ছদ্মনাম রাখে বা রাখতে বাধ্য হয়। এর পেছনে কাজ করে মানুষটি, সামনে থাকে আত্মরক্ষা বা আত্মগোপনীয়তা। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ নিজের প্রয়োজনে তার পরিবার-প্রদত্ত এবং সামাজিকভাবে পরিচিত নিজস্ব নামকে আড়াল করে। কিন্তু পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই ছদ্মনাম রাখার প্রবণতা রাজনীতিবিদ, শিল্পী ও লেখকদের মধ্যে লক্ষ করা যায় বেশি

'ছদ্মনাম' শব্দের ইংরেজি Pseudonym (সিউডনিম), an assumed name। শব্দটি এসেছে US সুড থেকে। এর একটি সাহেবি নামও আছে– Pen name, যা অনেকের কাছেই পরিচিত। এই Pseudonym শব্দের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Pseudnymon থেকে। আন্তঃবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, আলাদা দুটি গ্রিক শব্দ Pseudos যার অর্থ মিথ্যা বা মিথ্যা বিবরণ এবং Onoma যার অর্থ নাম; এ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত এ শব্দটি। অপরদিকে Ghostwriting বলেও একটি কথা চালু আছে। মূলত যে ব্যক্তির লেখা তার মনিব স্বনামে চালায় অর্থাৎ লেখক-কর্মচারী দিয়ে লিখিত লেখাই গোস্ট রাইটিং। অন্যদিকে ফরাসি একটি প্রবাদও চালু আছে noms de guerre (name of war or war names) অর্থাৎ যুদ্ধকালীন নাম বা যুদ্ধ-নাম। অর্থাৎ শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য নাম গোপন করা। বাংলায় 'ছদ্ম' শব্দটির অর্থান্তর করে পাওয়া যায় ছল, কপট দুটি শব্দ। সংস্কৃত ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন বা গোপন) +ই+ মন্ (করণ) মিলে ছদ্মন্ শব্দের উৎপত্তি। 'ছদ্ম' শব্দের বুৎপত্তি এই ছদ্মন্ থেকেই।

এ তো গেল ছদ্মনামের ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস। এবার আসা যাক লেখকদের মধ্যে ছদ্মনামের ব্যবহার প্রসঙ্গে। ছদ্মনামের ব্যবহার নিয়ে এই লেখা আমি মূলত বাংলাসাহিত্যের লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। তবে প্রাসঙ্গিকক্রমে বিশ্বসাহিত্যে অতি পরিচিত দুই-একজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন চিলির নোবেল বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদার কথাই বলা যাক। বিখ্যাত এই নামটি একটি ছদ্মনাম। তৎকালীন চেকোশ্লোভাকিয়ার জনপ্রিয় লেখক, সাংবাদিক জ্যাঁ নেরুদার নামানুসারে কবি তাঁর পিতৃদত্ত নাম 'রিকার্দো এলিয়েজের নেফ্তালি রেয়েজ বোসোয়াল্তো' দীর্ঘ নামটি বদলে নাম রাখেন 'পাবলো নেরুদা' এবং এই নামেই তিনি বিশ্বপরিচিতি লাভ করেন। এ নামটি আর আলাদা করার কোনো উপায় নেই। মিশে গেছে মানুষটির সাথে। আবার যেমন বলা যায় মার্ক টোয়েনের কথা। আসল নাম ছিল সেম্যুয়েল ল্যাগর্নি ক্লেমেন্স। হয়ে গেলেন মার্ক টোয়েন। এমন উদাহরণ জর্জ এলিঅটের ক্ষেত্রেও চলে। নাম ছিল মেরি অ্যান ইভানস্, সেই নাম আর কারও জানা নেই। 'উইলিয়াম সিডনি পোর্টার' বিশ্বসাহিত্যে 'ও. হেনরি' নামে খ্যাত। যেমন এরিক আর্থার ব্লেয়ার পরিচিত 'জর্জ অরওয়েল' নামে। একেই বলে ছদ্মনামের তলে হারিয়ে গেছে আসল নাম। এমনকি ভারতীয় কবি, গীতিকার গুলজারের নাম যে 'সম্পরণ সিং কালরা' তা হয়তো অনেকের কাছে অজানা। যেমন জানেন না অনেকেই কবি সমুদ্র গুপ্তের আসল নাম আবদুল মান্নান [সমুদ্র গুপ্ত নামটি ছিল কবি পুর্ণেন্দু পত্রীর ছদ্মনাম] অথবা ড. হায়াৎ মামুদের আসল নাম মনিরুজ্জামান অথবা পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের নামটি মূলত ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। এভাবেই অনেকেই তাদের নিজস্ব নামকে ছাপিয়ে ছদ্মনামে এতটাই জনপ্রিয় বা খ্যাত হয়ে পড়েন যে সেইসব মানুষের আসল নামটি অনেকেই ভুলে যান বা অজ্ঞাতে থাকেন। তা ছাড়া এই ছদ্মনামকেই সেইসব মানুষের পরিবার-প্রদত্ত নাম ভেবেও ভুল করে বসেন। এমন আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন কবি কায়কোবাদের আসল নাম ছিল মুহম্মদ কাজেম আল কোরায়েশী, কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের শেখ আজিজুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সারের নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ,

জহীর রায়হানের মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ্, শহীদুল জহিরের ছিল মোহাম্মদ শহীদুল হক। কেউ কেউ নিজের পুরো নামটি একটু যোজন-বিয়োজন করে লেখক নাম তৈরি করে নেন। যেমন, মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ হয়ে গেলেন শুধু আল মাহমুদ; যেমন যতীন্দ্রনাথ সরকার হলেন যতীন সরকার অথবা হরিনাথ মজুমদার হয়ে গেলেন কাঙাল হরিনাথ। কেউবা নিজের নামের সঙ্গে পিতা বা স্বামীর নামের অংশ জুড়ে পরিচিতি লাভ করেছেন। বেগম রোকেয়া বা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন– দুইয়ের যে নামই ডাকি না কেন তাঁর প্রকৃত নাম কিন্তু রোকেয়া খাতুন।

প্রশ্নটা রাখা যাক এমন– আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ কী ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন? এককথায় সবাই উত্তর দেবেন, ভানুসিংহ। 'ভানুসিংহের পদাবলী' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ এ ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন বটে। কিন্তু এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে যে উনি লিখেছেন তা অনেকের কাছেই নতুন লাগতে পারে। ভানুসিংহ ছাড়াও আরও ৮টি ছদ্মনাম তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন সময়ে। যেমন : অকপটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াশী, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীনকিশোর শর্মণঃ, বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ; এমনকি ব্যবহার করেছেন নারী-নামও, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, শ্রীমতি মধ্যমা। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও ছিল তেমনই ৯টি ছদ্মনাম। যেমন : কমলাকান্ত চক্রবর্তী, দর্পনারায়ণ পতিতুণ্ড, রামচন্দ্র, ভীষ্মদেব খোসনবিশ, রামশর্মা, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ব.চ.চ, শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বৈরাগী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিল ৫টি ছদ্মনাম : অনিলা দেবী, অনুরূপা দেবী, পরশুরাম [রাজশেখর বসুও এই ছদ্মনামে লিখতেন], শ্রী চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বিশি ব্যবহার করেছেন ৫টি : অমিত রায়, কমলাকান্ত শর্মা, প্র.না. বি, স্কট টমশন, হাতুড়ি। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, মুসাফির, রায় পিথৌরা, সত্যপীর প্রভৃতি নামে। বাংলাসাহিত্যে সম্ভবত সজনীকান্ত দাসের মতো এত ছদ্মনাম আর কেউ ব্যবহার করেননি। কবি, সমালোচক ও বিতর্কিত 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক এই মানুষটি এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৭টি নামে লিখেছেন। কুড়ুল রাম, গণদাশ বণিক, গণেশ সাহা, তরুণচাঁদ উধাও, দোদুল দে, নববিষ্ণু শর্মা, বটুকলাল ভট্ট, বস্তুসুন্দর ব্যথিক সম্পাদক, বেচারাম মাইতি, বেতাল, ভাবকুমার প্রধান, মেঠোভূত, লেখক, শ্রী স, সম্পাদক, হুতাশ হালদার, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়–এই ছিল তাঁর নামের বৈচিত্র্য। কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেন ৪টি ছদ্মনামে : নীললোহিত [গোপাল হালদারও এ ছদ্মনাম প্রয়োগ করেছেন], নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক–এ নামগুলো অনেকের কাছে জানা থাকতে পারে কিন্তু উনার 'পথচারী' ছদ্মনামটির সাথে অনেকেই পরিচিত নন।

এবার বিশিষ্ট কয়েকজন লেখকের এক বা একাধিক ছদ্মনাম তুলে দিচ্ছি। প্রথম ব্রেকেটের ভেতর না-হয় আটকা থাকল আসল নামটি। তাতা, শ্যাম রায় (সুকুমার রায়); টিমোথি পেনপোয়েম (মধুসূদন দত্ত); ধুমকেতু, ব্যাঙাচি (কাজী নজরুল ইসলাম); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়); অভিনব গুপ্ত, নীহারিকা দেবী [এ নামটি সাহিত্য-সরস্বতী বিদ্যাবিনোদিনী নূরন্নেসা খাতুনকেও ব্যবহার করতে দেখা যায়] (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত); অর্জুন রায় (রমাপদ চৌধুরী); আকাশ সেন, কেয়া মিত্র (অদ্রীশ বর্ধন); আধুনিকা দেবী, বিকর্ণ (নারায়ণ সান্যাল); ইন্দ্রজিৎ (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত); ঈশ্বর গুপ্ত, নির্মলাশিস সেন (সিদ্ধেশ্বর সেন); উলুখড় (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); কণিষ্ক, রতন হালদার (রাম বসু); কলমগীর, ত্রিবিক্রম বর্মণ (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত); কল্যাণ শঙ্কু, হাবু শর্মা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়); কশ্চিৎ প্রৌঢ়, ব.ভ.ম. (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়); কাফের, কৌটিল্য দেবশর্মা, যাযাবর, শ্রী পথচারী (বিনয় মুখোপাধ্যায়); কালকূট, ভ্রমর, যীশু দাশগুপ্ত (সমরেশ বসু); কালকেতু (মতি নন্দী); কালপুরুষ, সুপান্থ (সুবোধ ঘোষ); কীর্তনিয়া (প্রবোধকুমার সান্যাল); কুশ, বকযন্ত্র, বক্তিয়ার, যযাতি, স্বামী বেদানন্দ (কুমারেশ ঘোষ); কৃত্তিবাস ভদ্র, লেখকরাজ সামন্ত (প্রেমেন্দ্র মিত্র); কৃষ্ণসুন্দরী, ডমরুধর দ.হ., পীরু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়); কোন মহিলা (কুসুমকুমারী দেবী); গজমূর্খ, গৌড়ানন্দ কবি, ফা হিয়েন, বেতাল ভট্ট [কবিশেখর কালিদাস রায়ও এ নাম ব্যবহার করেছেন], রূপদর্শী (গৌরকিশোর ঘোষ); গ্রন্থকীট, নক্ষত্র রায় (তারাপদ রায়); চন্দ্রশেখর দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন, রামদাস, সারস্বত শর্মা, শিবপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহন রায়); চন্দ্রহাস (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়); চামার খায় আম, সত্যসুন্দর দাস, সব্যসাচী (মোহিতলাল মজুমদার); চিত্রগুপ্ত (সতীনাথ ভাদুড়ী); গৌড় মল্লার (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়); শ্রী (জীবনানন্দ দাশ); জমীরউদ্দীন মোল্লা (জসীমউদ্‌দীন); জাবালি, হর্ষ দেব (বিমল মিত্র); জ্যোৎস্না রায় (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী); টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র); ত্রিশূল, দাদুমণি (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়); দীপঙ্কর, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (গজেন্দ্রকুমার মিত্র); বীরবল, প্র.চৌ (প্রমথ চৌধুরী); ফকির, সুবচনী, পদাতিক, ঢোল গোবিন্দ (সুভাষ মুখোপাধ্যায়); বনফুল, বৃহন্নলা বসাক (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়); সুমিত্রা দেবী (মহাশ্বেতা দেবী); কনিষ্ক (রাম বসু); পঞ্চমুখ (শক্তিপদ রাজগুরু); চন্দ্রহাঁস (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়), শ্বেত কৃষ্ণ (কিন্নর রায়), বলাহক নন্দী (নীরদচন্দ্র চৌধুরী); বিদুর (বিমল কর); বিশ্বকর্মা (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত); বীরভদ্র (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়); বু.ব (বুদ্ধদেব বসু); মৈত্রেয়ী দত্ত (গৌরী আইয়ুব); যীশু দাশগুপ্ত (সমরেশ মজুমদার); রসুন আলি (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর); রূপচাঁদ পক্ষী, স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার (শক্তি চট্টোপাধ্যায়); লাল মিঞা, সৌনিক সেন (বুদ্ধদেব গুহ); লীলাময় রায়, হাবু শর্মা (অন্নদাশঙ্কর রায়); শঙ্খ ঘোষ, কুন্তল, শুভময় রায় (চিত্তপ্রিয় ঘোষ); শ্যাম রায় (সুকুমার রায়); শ্রী বাসব (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়); সুকন্যা (ইন্দিরা দেবী); ভট্টোজি, সুজন মাঝি (জ্যোতিভূষণ চাকী); সুমিত্র দেবী (মহাশ্বেতা দেবী); সুলতানা চৌধুরী (কবিতা সিংহ); হুতোম প্যাঁচা (কালীপ্রসন্ন সিংহ); অরূপ বিরূপাক্ষ, বিষ্ণু শর্মা, বাঞ্ছারাম, মেঘদূত (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র); পাতঞ্জলি সেন, বচন দত্ত (পবিত্র সরকার); স্বপ্নময় চক্রবর্তী (স্বপন চক্রবর্তী); নিধিরাম গুপ্ত, নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত); সুনন্দ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়); দ্বৈপায়ন (মুজফ্‌ফর আহমদ); বানভট্ট, দাদাভাই (নীহাররঞ্জন গুপ্ত); শঙ্কর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়); লঘুগুরু, শ্রী বাসব (দক্ষিণারঞ্জন বসু); গাজী মিয়া (মীর মশাররফ হোসেন); জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়); অবধূত (দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কালিকানন্দ); দৃষ্টিহীন (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার); রৈবতক (অজিত দত্ত); রুচি রায় (বিজয়া মুখোপাধ্যায়); মৌমাছি (বিমল ঘোষ) প্রমুখ।

তালিকা আরেকটু দীর্ঘ করা যাক : অপরাজিতা দেবী (রাধারানী দেবী); কাকাবাবু (প্রভাত কিরণ বসু); কালপেঁচা (বিনয় ঘোষ); ইন্দ্রনাথ মিত্র (অরবিন্দ গুহ); নিরপেক্ষ (অমিতাভ চৌধুরী); নীলকণ্ঠ (দীপ্তেন্দ্র সান্যাল); কাফি খাঁ (প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী); যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক); মহাস্থবির (প্রেমঙ্কুর আতর্থী); স্বপন বুড়ো (অখিল নিয়োগী); ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায়); বেদুইন (দেবেশ রায়); ভীষ্মদেব (দেবব্রত মল্লিক); বিজ্ঞান ভিক্ষু (ললিত মুখোপাধ্যায়); দীপক চৌধুরী (নিহার ঘোষাল); চাণক্য সেন (ভবানী সেনগুপ্ত); শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার); ভাস্কর (জ্যোতির্ময় ঘোষ); প্রবুদ্ধ (প্রবোধ চন্দ্র বসু); শ্রীভট্ট (দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়); অমিয়া দেবী (অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়); ত্রিলোচন কলমচী (আনন্দ বাগচী); নবকুমার কবিরত্ন (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত); পঞ্চানন (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়); উদয় ভানু (প্রাণতোষ ঘটক); দৃষ্টিহীন (মধুসূদন মজুমদার), উত্তম পুরুষ (সন্তোষকুমার ঘোষ)।

আবার কারও ছদ্মনামটি যেন একটু আলাদা রকমের। ঠিক যেন ছদ্মনাম নয়, আবার ছদ্মনামও। তেমনই একজন হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'দেশের ব্যথার সাথী', 'বঙ্গের রঙ্গদর্শক'– এই ছিল তাঁর স্বকৃত নাম। তেমনি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় রেখেছিলেন 'নাদাপেটা হাঁদারাম'। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আরও একটু ভিন্নতর না হলে কি আর চলে। গদ্যের জনক বলে কথা! নিজের 'রত্নপরীক্ষা' বইটিই যে তিনি লিখেছেন 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' এমন কিম্ভূত ছদ্মনামে। •

অঞ্জন আচার্য
কবি ও গল্পকার

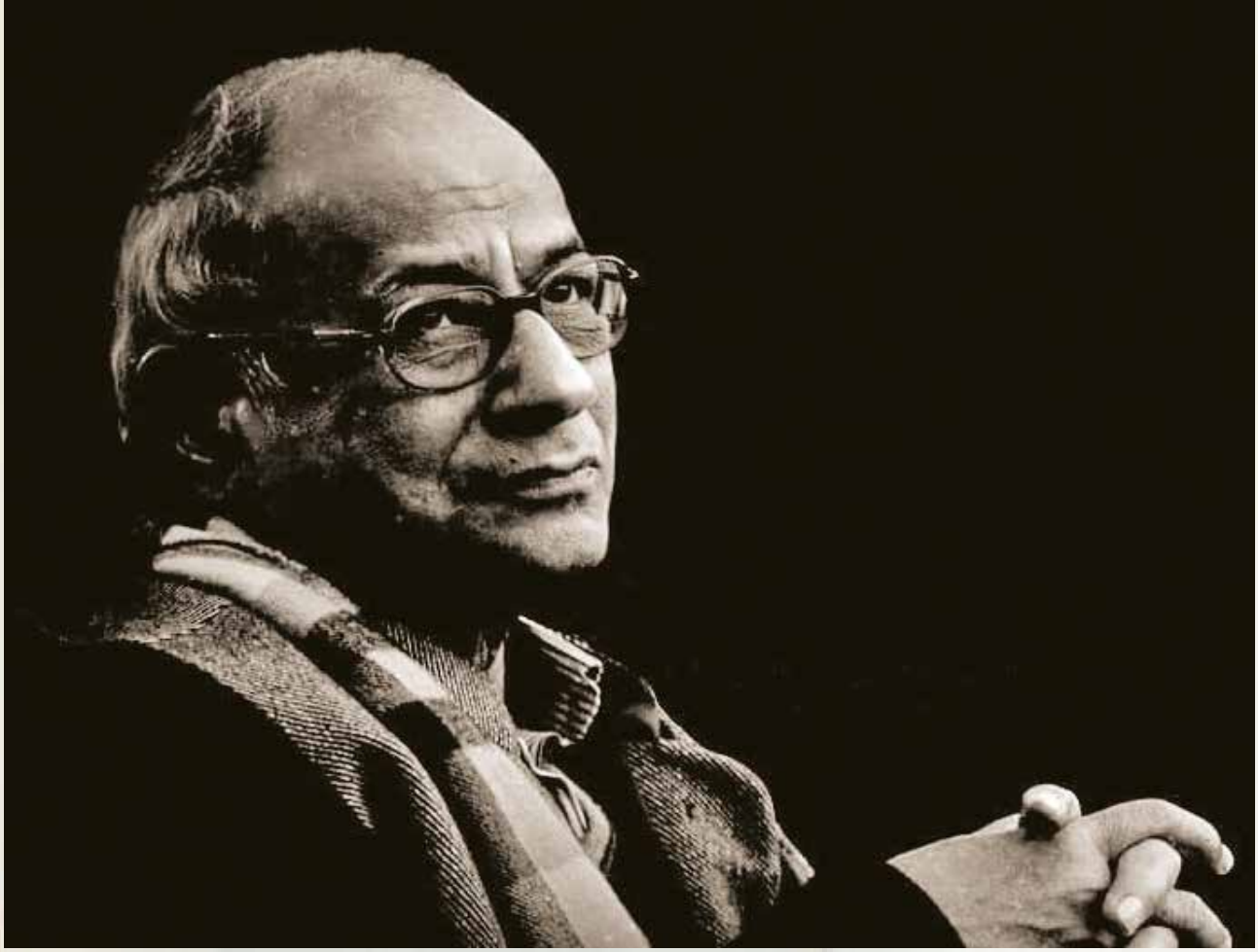

অনূদিত কবিতা

মঙ্গলেশ ডবরালের কবিতা

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : অজিত দাশ

[৯ ডিসেম্বর ২০২০ করোনাক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন হিন্দি সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি মঙ্গলেশ ডবরাল। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ 'পাহাড় পর লালটেন', 'ঘর কা রাস্তা', 'হাম যো দেখতে হ্যাঁয়', 'আওয়াজ ভি এক জগাহ্ হ্যাঁয়'; কবিতার বিষয় এবং উপস্থাপনার নতুনত্ব হিন্দি সাহিত্যের পাঠকদের মাঝে বেশ প্রশংসা পেয়েছে। এই জনপ্রিয় কবি কবিতায় প্রতীকিভাবে তুলে ধরেছেন সমাজ-বৈষম্যের বিভিন্ন দিক

ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের টিহরী গারওয়াল পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কাফলপানীতে ৯ মে ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন মঙ্গলেশ ডবরাল। দেরাদুনে শিক্ষাজীবনের পাঠ চুকিয়ে চলে যান দিল্লিতে। ১৯৬০ এর শেষ দিকে হিন্দি পেট্রিওট, ভারতভবন এবং আশপাশের বেশ কিছু দৈনিকে কাজ করার পর ভুপাল মধ্যপ্রদেশ কলা-পরিষদ, ভারতভবন থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন পূর্বাগ্রহ-তে সহযোগী সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন।

সেখানে বেশ কয়েকবছর কাজ করার পর সত্তর দশকের শেষের দিকে জনসত্তা পত্রিকার সম্পাদক হন। 'সাহারা সময়' পত্রিকায় কাজ করার পূর্বে এলাহবাদ ও লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'অমৃত প্রভাত' এর মতো পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। পাশাপাশি কনসাল্টট্যান্ট হিসেবে যুক্ত ছিলেন ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এর সঙ্গে। হিন্দি মাসিক পত্রিকা 'পাবলিক এজেন্ডা'র– সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন দীর্ঘদিন।

মূলত 'জনসত্তা'-র রবিবার পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন মঙ্গলেশ ডবরাল। এই পত্রিকায় কাজ করার সময় থেকে নতুন প্রজন্মের অসংখ্য হিন্দি তরুণ কবি ও লেখকদের তিনি পথ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর অসামান্য লেখনীর জাদুতে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্র স্থাপন করে গেছেন।

তাঁর প্রধান পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও হিন্দিতে 'অপার খুশি কা ঘরানা' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন, অরুন্ধতী রায়ের The Ministry of Utmost Happiness গ্রন্থটি।

গদ্যগ্রন্থ হিসেবে 'লেখক কি রোটি', 'কবিকা আলোকপান' আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ডবরাল 'হাম যো দেখতে হ্যাঁয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য ২০০০ সালে সাহিত্যে ভারত সরকারের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার-এ ভূষিত হন। তাঁর কবিতাগুলো প্রধান ভারতীয় ভাষাসহ ইংরেজি, রাশিয়ান, জার্মান, ডাচ, স্প্যানিশসহ আরো বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়ার্ল্ড রাইটার্স প্রোগ্রাম'-এ সম্মানীয় অতিথি হিসেবেও অংশগ্রহণ করেন।]

বর্ণমালা

একটা ভাষায় অ লিখতে চাই
অ-তে অজগর অ-তে অপূর্ব
অথচ লিখতে হয় অ-তে অনর্থ, অ-তে অত্যাচার
চেষ্টা করি ক-তে কলম অথবা করুণা লিখতে
অথচ লিখতে থাকি ক-তে ক্রূরতা, ক-তে কুটিলতা
এতদিন খ-তে লিখে এসেছি খরগোশ
অথচ এখন খ-তে খবরদারের পদধ্বনি শুনতে পাই
ভেবেছি ফ-তে শুধু ফুলই লেখা হয়
অনেক অনেক ফুল–ঘরের বাইরে,
ঘরের ভিতর, মানুষের ভিতর
অথচ আমি দেখি সব ফুল চলে যাচ্ছে
নির্দয়, পাষাণদের গলায় দেওয়ার জন্য

কে যেন আমার হাত চেপে ধরে আর বলে–
ভ-তে লেখো ভয় যা এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে!
দ-তে দমন আর প-তে পতনেরই সংকেত
আততায়ীরা ছিনতাই করে নেয় আমাদের সব বর্ণমালা
তারা ভাষার হিংসাকে বদলে দেয় সমাজের হিংসায়
এখন হ-কে হত্যা লেখার জন্য সুরক্ষিত করা হয়েছে

আমরা যতই হ-তে হলো অথবা হরিণ লিখি না কেন
তারা প্রতিবার হ-তে হত্যা লিখতে থাকবে।

ছায়া

ছায়া ততটাই জীবিত
যতটা তুমি
তোমার আগে পিছে
অথবা তোমার ভেতরে
লুকিয়ে রয়েছে
অথবা সেইখানে
যেখান থেকে তুমি
চলে এসেছ।

শব্দ

কিছু শব্দ চিৎকার করে
কিছু শব্দ তাদের পোশাক ছিঁড়ে
ঢুকে পড়ে ইতিহাসে
কিছু শব্দ নীরব হয়ে যায়।

এই সেই চোখ

করুণা আর ক্রূরতা গলাগলি করে আছে
কিছুটা গৌরব গভীর শরমে ডুবে আছে
লড়াই করার বয়স যখন
লড়াই ছাড়া অবসর কেটে যাচ্ছিল–
সেখানে কোনো যুদ্ধ শেষে
ফিরে আসা সৈনিকের যাতনা রয়েছে
আর এই সেই চোখ যে আমাকে বলে–
প্রেম–যার ভেতর আর সব টিকে আছে
কতটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে

ময়ুখ চৌধুরী

প্রমোদ-প্রহেলিকা

প্রথাগতভাবে তোমরা যাকে চাঁদ বলো–
ওটা এমন কিছুই নয়। তিনজন চন্দ্রপর্যটক বহু আগে
এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখে আলতোভাবে হাত রাখো কাঁধে।
কেন এই স্পর্শ–অন্তর্গত অর্থই-বা কী?

চন্দ্র বলো, শশী বলো, প্রকৃতবিচারে ওটা এক ধরনের
সোলার বাল্বের দুধমাতা।
দোকানে যে সব বাল্ব পাওয়া যায়
সেগুলোর নিভৃত হৃদয়ে ঘুমন্ত দহন,
মাকড়সার জালের মতন কারুকাজ।
গোলাকার ছিদ্রহীন কাচের দেয়াল, তবু সেইখানে
অচিন মাকড়সা শিল্পী কী করে রাখল তার স্মৃতি!

আজ অমাবস্যা রাত,
কালো জর্জেটের শাড়ি মেলেছে আকাশ;
চলো, আমরা লুকোচুরি খেলি। দহন আকুল
অন্ধকার বাল্ব নিয়ে খেলাধুলা করি।
এইবার তুমি চন্দ্র, আর আমি চন্দ্রপর্যটক।

অনুপম মুখোপাধ্যায়

সমুদ্রে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে

সমুদ্রও ডাঙার কাছে এসে দয়া চাইছে

যখন কয়লাখনির মধ্যে নিভে আছে
আগুনের অকৃতজ্ঞ হাসি

ডাঙা সমুদ্রকে ফিরিয়ে দিচ্ছে বারবার

আমার পায়ের নিচে এখন জল নাকি বালি
ক্ষমা নাকি করুণা

মাথার উপর একটা অবিশ্বাস্য আকাশ
নিষ্ঠুরতার ব্যাপ্তি দিয়ে সমুদ্রের পরিসীমা মাপছে

জাহিদ সোহাগ

তুমি বন্ধুর মেয়ে

তুমি বসতে পারো, শীত; চুলায় পানি চাপালে চা হতে আর কতক্ষণ? সারাটা বছর আমাদের সংসারে আগুন, কোনো সংগীত নেই, কেবল দগ্ধ হাওয়া;

তুমি এলে হঠাৎ-প্রেমের মতো, ঠোঁটে ঠোঁট ঠেসে দেই; যেন মুহূর্ত চুরমার করে আমরা খুঁড়ে বের করি খনিজ;

তেমন কিছু চাওয়ারও নেই, রাশি রাশি মেঘ ধুনে নিজেই হয়েছি সিংহ;

আলমারি খুললেই একজোড়া মোজা, বেড়ালের লোম, আর কালো কর্কশ যেন মধ্যদুপুরে জেগে থাকে;

তুমি বন্ধুর মেয়ে, আমাদের দেখে শীত ফেলে চৈত্রে চলে যেও না;

সুদীপ্ত মাজি

মথুর

লীলার অপূর্ব ছল। নির্ভরতা দিয়ে ঘেরা ভক্তির দেওয়াল।
বিষয়বিষের থেকে মুমুক্ষার সেতু ঠিক কত দূরে থাকে?

কাশীদর্শনের পথে পরীক্ষার খাতা এসে পড়ে।
বড়ঠাকুরের গোঁ-এ মথুর লিখলেন।

–কল্পতরু, তুমি কিছু নাও?

বাবা চাইলেন কমণ্ডলু।

ত্যাগের আনন্দব্রতে মথুরের চোখে জল এলো

নামের মাস্তুলে পাখি ঘন হয়ে এসে বসল আরও...

চাণক্য বাড়ৈ

বৃষ্টির দৃশ্যাবলি

আকাশ ব্যাপ্ত করে কখন নেমেছে বৃষ্টি–চরাচরে ফোয়ারার মতো ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ জলের ধারা–বিপুল উৎসাহ নিয়ে গাছেরাও সেরে নিচ্ছে বাৎসরিক স্নান–

আমি ভরদুপুরের বেলা কণ্ব মুনির আশ্রমে বসে দেখছি ভাদ্রের বৃষ্টি–

যেন রুপালি ঝরনার জলে নাইছে নদী–রাঙা রঙ্গন আর গন্ধরাজের আহ্লাদিত কলি–পালক সরিয়ে নিয়ে ঠোঁটে, একটু একটু করে গা ভিজিয়ে নিচ্ছে পাখি–উঁচু উঁচু গাছ, ছোট ছোট চারা–নৈমিষারণ্যের প্রতিটি বৃক্ষের শাখা–

নিমেষে, প্রাণের স্পর্শ পেয়েছে মাটি–পেয়েছে নতুন সুর মালিনী নদীর ঢেউ–জলকেলিতে মেতে উঠেছে মহর্ষি কণ্বের রাজহাঁস–

আর পরিস্রুত জলে শরীর ভেজাবে বলে বৃষ্টিতে নেমে গেছে আশ্রম বালিকার দল– অনসূয়ার আঙুলের ডগায়, শকুন্তলার ঘন চুলে, প্রিয়ম্বদার বুকের উপত্যকায় ছলাৎছল নেচে উঠছে বর্ষা, লীলায়িত বৃষ্টির জল–

এই ভরদুপুরে, আমি কণ্ব মুনির আশ্রমের বারান্দায় বসে দেখছি ভাদ্রের বৃষ্টি–

হাশিম কিয়াম

বরফের খাঁচা

বুনো মোরগের লাল পালকের তুলিতে কালো মেয়ে
গাছের শরীরে আঁকছে শিকারির বুলেটে নিহত প্রেমিকের
ছবি; তার চোখের ভাষা অনুবাদ করে কাঠগোলাপ
ঝরে যাচ্ছে রক্তের লবণে পুড়ে ছারখার
মাটিতে; শুকনো পাতায় মোড়ানো প্রেম জ্বলছে কুঁড়েঘরের বাতায়
সবুজ পাতার দেশ হারিয়ে ফেলেছে রঙের ঢেউ...

টিয়ের ঝাঁক প্রাগৈতিহাসিক মায়া ভুলে উড়ে যাচ্ছে
অচিন দেশে
মেয়েটিও কি টিয়ে হয়ে উড়ে গেল বরফের
খাঁচায় বন্দি হতে? ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে গেল
সবুজের পাহাড়, পাখির গান পুড়ে মরল দানব
হুইসেলের নিশ্বাসের আগুনে... জ্বলে উঠল নিয়ন ল্যাম্পের চোখ...

শোয়েব শাহরিয়ার

অনার্য কুঠার

প্রান্তর থেকে গোরুর খুরে ভর
করে
যে-মাটিটুকু স্মৃতির মতো
আজো
গোয়ালে আসে আমার তো
ওইটুকু পুণ্য।
ডিজিটাল পেয়ালায়
পেয়ারার যে রসটুকু থিতানো
বাঙালি প্রত্নপুরুষের অরণ্যঠোঁট
আর্দ্র তাতে,
মনে হয় অবুঝ পালং আর
কমলা-গাজরে
জাতির অনাঘ্রাত স্বর লেপে
ভেসে ওঠে খরস্রোতা
ব্রাহ্মীলিপি।

স্বেদেস্বাদে বিল্বপত্র ফুঁড়ে
আছে ক্ষুধাগন্ধা
অনার্য কুঠার।

আবদুর রাজ্জাক

অয়নপথে কোনো একদিন

সেবাদাস নয়, ক্রীতদাস হতে ইচ্ছে করেছিল, তোমার।
ইচ্ছে করে ফুল কিংবা ফলপোকা হয়ে নিরাপদে থেকে যাই,
গাছের গোপন ডালে বসে শিকারিদের দেখি।

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করার আগে তোমার দুর্ভাবনায় স্নিগ্ধ হয়েছি,
বিজ্ঞ সময়ে চেটে দেই বাঘের গাল, ঝরে পড়া মর্মর,
মাংসভূক জেনেও ফিরে আসি অয়নে তোমার।

যায়, পরিযায়ী পাখিরা যায়, ডানার নিঃস্বন রেখে যায় প্রশাখায়,
সামান্য হাসি দিয়ে পল্লবিত করেছে বন উপবন।
ভালো থাকার নানা পন্থা, ফলের শিয়রে রেখে অন্ধ উইপোকা
কেটেছে দুপা, কেমনে বাহিরিব গৃহে তোমার।

সুবর্ণা গোস্বামী

স্ব ও স্বজন

বাড়িগুলো বোন। আমি বেনে সম্প্রদায়ের একজন ডাকঘর। কেউ বিড়াল ডাকেন আর কেউ কুড়ালের কারখানা। বৃক্ষগুলো ভাই, জগতের উত্তরাধিকার কিছুতেই দিলো না। যদিও বেতারকূলে আমার কেউ নেই, তবু বাজছে রইরই সেতারে হইচই হরবোলা। তাই হতে পারে নাচুনে গরমমসলায় শীতল হচ্ছে সুখশীর্ষ, অতলে যাওয়ার পর এই নাম উড়াল হবে না।

রাস্তাগুলো পাড়াতুতো দাদা। চাইলেই বিছিয়ে দেয় শরীর আর না চাইলেই উঠে যায় নিরামিশ ভ্রমণের দিকে। নিচে নামতে নামতে মনে পড়ে আখরোট মা ব্যায়ামবীর বাবার দাঁতের নিচে পিষে যেতেন প্রতিদিন নৈশভোজের শেষে। এখন খুঁজি অর্ধেক শরীর, যার সঙ্গে আত্ম নেই অথচ খচিত হচ্ছে তারই আগুন আমার রোম ও রন্ধ্রে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাই একটা গভীর গর্ত। ধানসোনা চুরি করে এ শরীরে কার রচনা?

দাঁতে কাটো দ্রৌপদীবসন, নখে ছিঁড়ে দাও হরিণ–এইটুকু গেয়ে বন্ধ হয় জলজ বেতার। জানতে পারি বেনে সম্প্রদায়ের আমি কেউ নই, নই কুড়ালকূলের। নই বিড়াল, নই বেতার। আমি আসলে বামন নক্ষত্রের খামখেয়ালি আলো। খুব দেরিতে পৌঁছালো!

নিষাদ নয়ন

মরাল-মশান

আমাদের চোখের ভিতর লুকানো থাকে
অতলান্ত শূন্যতা, হৃদয়ের ছায়ানৃত্য-কর্মশালা
সেই চোখের মধ্যেই জমানো বিজন-পাথুরে
নির্জনতা অথচ প্রত্নদিনের ঘুমের শিথানে
অন্ধকারের জরায়ু যেন এক গন্ধর্বগুচ্ছ
তবুও মানুষ ভুলতো একা আর একাকী ঈশ্বর

এইসব কেবলই সমূহ ধূসর স্বপ্নের কতিপয়
রূপান্তর অথবা কষ্টের কোরাসে ঘনীভূত
হওয়ার সমুদ্রে ভাসান-বিষাদের ছায়ায় ভাসে
রাজহাঁসের পালক যেন চন্দ্রগ্রস্ত ছাতিমের রাত
ফুলের ঘ্রাণ ছুঁয়ে আছে রাধার ব্রীড়ায় কিংবা
লুব্ধক জ্যোতির্ময়ী অর্ধনারীশ্বর আড়ালে বসে

সবাই সেঁধে যাচ্ছে জীবন-মৃদঙ্গের তাল-বেতাল
অনুপ্রাস, কেবলই রোদ্রাহত হচ্ছে প্রাচীন হৃদয়ের
তমস-নদী, আকাশের নিচে অবিরাম কপালভাতি মুদ্রা
ঠুকে দিয়ে নিদ্রাহীন সন্তাপ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে আমাদের
অন্তলীন বিষাদের ঘোড়া, তবু উড়ে যায় রাত্রির ভ্রমণ
গোলাপি শ্রমণের চৌষট্টি আসনে প্রাণায়াম পূর্বরাগ, প্রেম

কুশল ভৌমিক

হলুদপতন

কোনো কোনো বাউলসন্ধ্যায় আকাশ থেকে নেমে আসে একতারা। চাঁদের শরীর থেকে নেমে আসা মৃত্যুর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে উঠোনে। দুহাত শূন্যে তুলে কে যেন গেয়ে ওঠে বৈষ্ণব পদাবলি। যমুনার জলে ভেসে ওঠে বিগত জন্মের আক্ষেপ। ঘর ছাড়েন শ্রী গৌরহরি।

বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি কেন রাধা হতে পারো না?

চৈতন্য চরিতামৃত থেকে খসে পড়ে হলুদ রঙের পাতা। হলুদ চাঁদের সুষমায় হারিয়ে যায় আড়াল। হলুদ পাতাগুলো ঝরে পড়ার প্রস্তুতি নেয়। সারা গায়ে হলুদ মেখে তিনিও যাচ্ছেন আপন আলয়ে।

হলুদসন্ধ্যায় সবাই কি শিখে নেয় পতনের মন্ত্র?

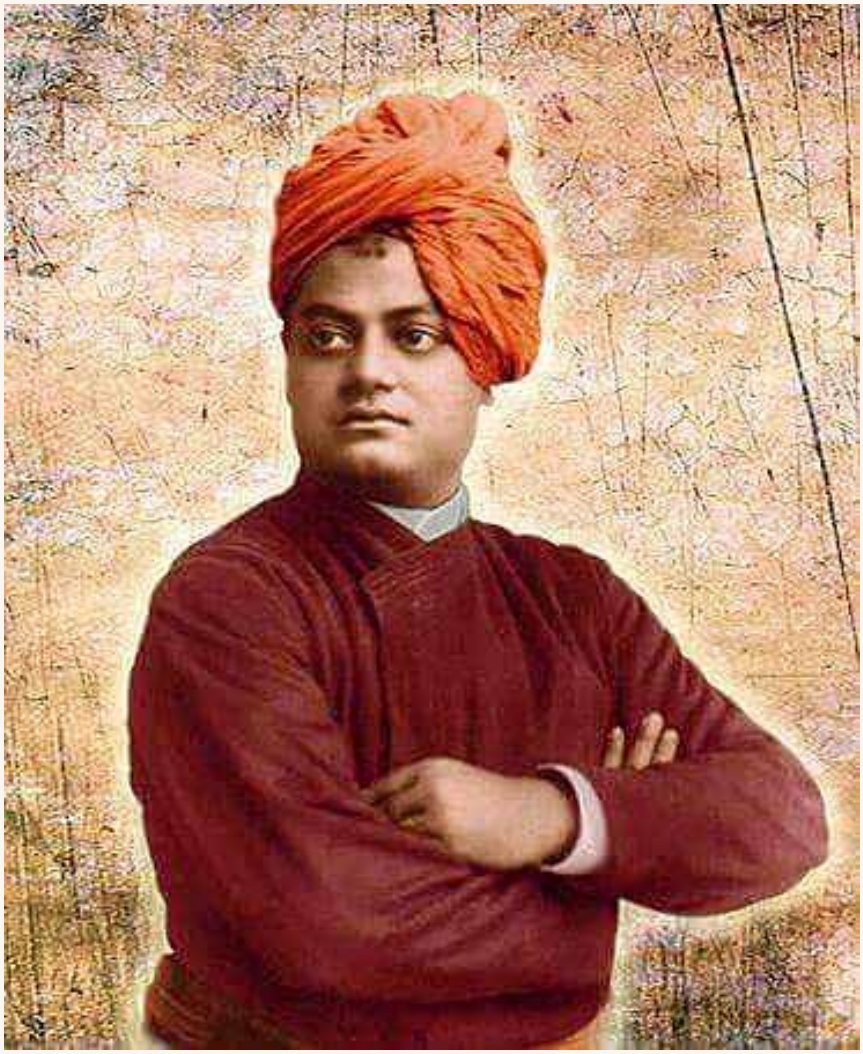

মহিমময় জীবনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

প্রবন্ধ

'...মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যত কিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে, জগতে যত বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে।' ইট-কাঠ-পাথরের ভেতর ইতিহাসের উপাদানকে খুঁজে বেড়ানো নয়, বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন মানুষের ওপর। ইতিহাসের শুরু এবং শেষ এই মানুষকে নিয়েই। এক মহিমময় জীবনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি কর্ম বলতে বুঝতেন পরোপকারকে। কারণ তাঁর কাছে আর বাকি সমস্ত ছিল কুকর্ম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজিকে লেখা এই চিঠিতে বিবেকানন্দের মানবপ্রীতির গভীরতা স্পষ্ট হয়। সেই সঙ্গে তিনি দিয়েছিলেন সতর্কবাণী। আত্মসুখ নয় সকলের সুখ। আমি আমার জন্য বাঁচব না, আমি প্রতিবেশীর জন্য বাঁচব, সমাজের জন্য বাঁচব, দেশের জন্য বাঁচব

তাঁর কর্মধারার প্রভাব অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই সমাজ ও ধর্মচিন্তায় সব থেকে বেশি পড়েছিল।

উনিশ শতকে বাংলার সমাজ জীবনের গতিটা একটু দেখা দরকার। এই গতির ভেতর ওঠাপড়ার বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে। প্রতি যুগেই সমাজ এক এক বাঁকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যায় অবশ্যই। কিন্তু তারপর তার প্রবণতা থাকে একটু নিচে নেমে আসার। সামান্য পিছিয়ে আসার। যদিও সেই নামাটা বা পিছিয়ে আসাটা উচ্চতাজনিত নয়। বরং সেটা নতুনের সঙ্গে পুরোনোর একটা সাময়িক বন্ধন বলা যেতে পারে। এভাবেই সমাজ বিবর্তন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়। বাঙালির জীবনে এই বিবর্তনের ভেতর দ্বন্দ্বভাব সর্বত্র। কখনো তা সামাজিক ক্ষেত্রে, কখনো ধর্মীয় ক্ষেত্রে, কখনো অর্থনৈতিক, কখনো রাজনৈতিক। উনিশ শতকে সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গ বাঙালি সমাজের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো প্রবল আকারে বয়ে গিয়েছিল। আসলে উনিশ শতক বাংলার সামাজিক ইতিহাসে যুগসন্ধিক্ষণের শতক। এই সময় শিক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে এক নতুন চেতনার জন্ম হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এক্ষেত্রে ভারতবাসী তথা কিছু সংখ্যক বাঙালির ভেতর কাজ করেছিল চেতনার। কিন্তু পাশাপাশি এই শতকেই নানা কুসংস্কার, বর্ণবৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদিকেও আমাদের লক্ষ করতে হবে। ফলে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ পার হয়ে বিবেকানন্দের সময় তা আরো জটিল আকার ধারণ করে। হয়তো সেই কারণেই সবল মস্তিষ্ক এবং নিরর্থক ভাবমুক্ত পরিষ্কার মনের মানুষ চেয়েছিলেন স্বামীজি। আসলে তিনি জানতেন, '...যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে বুদ্ধিনাশ হয়, মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে; পতনের ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন' করে।

সারা ভারত ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ খুব সামনে থেকে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক অবক্ষয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদির ভেদাভেদ থেকে শুরু করে নারী জাতির প্রতি সমাজের বৈরীভাব স্বামীজিকে ব্যথিত করে। তিনি মহাপাপ হিসেবে দেখেছিলেন, মেয়েদের পায়ে দলা আর 'জাতি জাতি' বলে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। আজ থেকে একশো ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে পাই। ব্রাহ্মণের খাদ্য গ্রহণের সময় শূদ্র সেখানে অবস্থান করতে পারে না, এ বিষয়টি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি অনুসন্ধান করে আরো জেনেছিলেন, 'ব্রাহ্মণ শূদ্র একসঙ্গে পথে পথিক হইলে ব্রাহ্মণকে কাপড়ের কাণ্ডার খাটাইয়া তন্মধ্যে আহার করিতে হয়।' স্বামীজির কাছে এই কুসংস্কার ছিল নিছকই কতকগুলো বংশপরম্পরায় মেনে আসা দুর্বলতার চিহ্ন। তাই তিনি কুসংস্কারগ্রস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে বলেছেন, তারা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ করে। অতএব ওইগুলি থেকে সাবধান হতে হবে। সেই সঙ্গে তেজস্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভাবনাও ভাবতে বলেছেন স্বামীজি।

বর্ণপ্রথার দুঃসহ অবস্থার মধ্যেই উঠে এসেছে সমাজের আরেক দিকের অবক্ষয়ের চিত্র। তা হল নারী সমাজ। রাজা রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন-এর মতো নানা সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হলেও সেভাবে নারী মুক্তির ঘটনা লক্ষ করা যায় না উনিশ শতকে। আসলে শিক্ষা থেকে নারীদের দূরে রাখাই যেন একটা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। কিন্তু শিক্ষার প্রতি মেয়েদের আগ্রহের প্রতিফলন আমরা উনিশ শতকের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় খুঁজে পাব। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৯, ২৮ মে) পত্রিকায় দুই জায়ের এক কাল্পনিক কথাবার্তা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে একজন প্রশ্ন করেছেন, '...যদি শাস্ত্রে দোষ নাই, তবে আমরা কেন না শিখব, মেয়েরা কেন না শিখবে? হতভাগা পুরুষরা যদি রাজী না হয়, আমি তো বাপের বাড়ী চলে যাব, আমার ভায়েরা লেখাপড়া শেখাবে।... আমরা কি চিরকাল আঁধারে থাকব, পৃথিবীর কিছুই জানব না?' এ শুধু হিন্দু সমাজের চিত্র নয়। মুসলমান সমাজেও এর আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে। 'বামাবোধিনী পত্রিকায়' তাহেরন্নেসা তাঁর মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। শিক্ষা গ্রহণের প্রতি মেয়েদের এই আগ্রহ ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা প্রতিবন্ধকতাগুলিকে মেনে নিতে চাননি। বরং এই প্রতিবন্ধকতাগুলি যে আসলে পুরুষশাসিত সমাজের সৃষ্ট, তা তাঁরা বুঝেছিলেন নিজস্ব বুদ্ধি দিয়েই। বিবেকানন্দের দৃষ্টি প্রাচ্য পাশ্চাত্য–দুই গোলার্ধকে মিশিয়ে দিয়েছিল। নিবেদিতাকে যেমন তিনি আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য বলেছিলেন; সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন, অন্যে মেয়েদের জন্য সমাজ সংস্কার, আইন ইত্যাদি তৈরি করে দেবে; এ কোনো কাজের কথা নয়। সুতরাং মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। স্বামীজির কাছে ভারতীয় নারীর আদর্শ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ। তারা পাশ্চাত্যের মেয়েদের মতোই স্বাবলম্বী হবে, হবে নির্ভীক। আবার প্রাচ্যের নারীর মতো তাদের মধ্যে থাকবে নম্রতা-বিনয়-ধৈর্য ইত্যাদি। স্বামীজি কিন্তু সাহসী নারীদেরই পছন্দ করেছেন। তাই ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী, চিতরের রাজমহিষী পদ্মিনী তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিলেন। সমাজে যেসব মেয়ে মুখ বুঝে অপমান সহ্য করত, তাদের তিনি 'প্যানপ্যান' 'কাঁদুনে' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলার, নারীকে মাতৃভাবে দেখার দৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন সঙ্ঘজননী শ্রী শ্রী মা সারদাদেবীর কাছ থেকে। তাই স্বামীজির কাছে নারীর প্রকৃত পরিচয় সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। নারীকে প্রকৃতভাবেই শিক্ষিত করে তোলা, তার অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা স্বামীজি ভেবেছিলেন। কোনো নারী যদি ভবিষ্যতে সন্ন্যাসিনী হতে চায়, সে অধিকার তার আছে। সে কথা ভেবেই স্বামীজি স্ত্রী মঠের কথাও বলেছেন। নারী শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র যে নয় তা স্বামীজি বারবার বলেছেন বিভিন্ন লেখায়। তাঁর মতে, যে নারী যত উন্নত হবেন তিনি ততই চরিত্র ও মনের নারীসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারবেন। ভারতমাতাকে আবার পুনরুজ্জীবিত দেখতে হলে নারী শিক্ষা ও জাগরণের প্রয়োজন ছিল।

একই সঙ্গে জনগণের শিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বদেশ সেবার জন্য শিক্ষিত মানুষের আত্মত্যাগ ইত্যাদির প্রতি স্বামীজি বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন ভারতবর্ষের মানুষ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৈজ্ঞানিক চেতনার দ্বারা, মানবিক অধিকার বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ুক সমস্ত পৃথিবীতে। এমনকি হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ সমুদ্রযাত্রাকেও তিনি প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছেন। তাই নিজে বারবার সমুদ্র লঙ্ঘন করেছেন। প্রকাশ্যে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে আহারাদি করেছেন শুধু সামাজিক ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতবর্ষ যে কখনো আধুনিক ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে না, এ স্বামীজি অক্ষরে অক্ষরে বুঝেছিলেন। সদর্পে বলেছিলেন, 'ভুলিও না– নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।' এই ভারতবর্ষ যেমন ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ, একই সঙ্গে চণ্ডালেরও ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ আবার একই সঙ্গে দরিদ্রেরও ভারতবর্ষ। তাই আজ ভারতবর্ষ থেকে ছুঁৎমার্গ অনেকটাই কমে এসেছে। আমাদের পূর্ব ভারতে তা আর দেখাই যায় না। দক্ষিণ ভারতেও আগেকার অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে। অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও এই কুসংস্কার ও নানা ধরনের বিধি নিষেধ কমে আসছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন নীরবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজ করে চলেছে প্রতিদিন। তাই পঙ্‌ক্তিভোজনে উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, হিন্দু মুসলমান সকলে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন আজও। ঠিক এখানেই বেদান্তের সঙ্গে স্বামীজির সমাজচিন্তা এক হয়ে গেছে। বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। সে রোগের লক্ষণ দেখিয়ে তা থেকে উদ্ধারের উপায় বলে দেয়। বেদান্ত বলে, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করিয়ে দিলে বিশেষ কিছু উপকার হয় না। তাকে ওষুধ দিতে হবে, প্রতিকারের উপায় বলে দিতে হবে। বিবেকানন্দের সমাজ চিন্তার মধ্যেও সেই প্রতিকারের উপায়-অনুসন্ধান লক্ষ করা যায়।

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামীজি বেদান্তবাদী দর্শনের কথা বলেছেন বারবার। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে এই একই চৈতন্যের সত্তা বর্তমান। তবে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব শক্তির তারতম্য অনুসারে এর প্রকাশ বিভিন্ন হয়ে থাকে। গুরু রামকৃষ্ণদেব তাঁর এই শিষ্যকে সমস্ত কাজের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের যথাসর্বস্ব তাঁকে দিয়ে তিনি ফকির হয়েছিলেন। তাই স্বামীজিও গুরুপ্রদত্ত আধ্যাত্মিক ভাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে আরো এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কি সেই ইচ্ছা! স্বামীজি বলেছিলেন, 'আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি–আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা।'

স্বামীজি এমন এক ধর্মের কথা বলেছিলেন যে ধর্ম পশুকে মনুষ্যত্বে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। আধ্যাত্মিকতার অর্থই চরিত্র শক্তি

অর্জন করা। পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করতে বলেছিলেন স্বামীজি। কারণ তার মধ্যেই সমস্ত ধর্মের অধিষ্ঠান। ধর্ম শুধু মতবাদ নয়, এ এক সাধনা। সৎ হওয়া আর সৎকর্ম করা এই দুইয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম আত্মগোপন করে আছে। তাই ধর্মকে বাইরে নয়, আমাদের অভ্যন্তরে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি মানুষ, তার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে। এর জন্য ধর্মের লক্ষ্যে পৌছতে হবে। আর এই পৌছানোর উপায় কে 'যোগ' বলে। যোগগুলো চারটি নামে বিভক্ত। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ। যে পদ্ধতিতে মানুষ কর্ম এবং তার কর্তব্য পালন করে এবং সেই পালনের মধ্য দিয়েই দেবত্বকে উপলব্ধি করে, তা-ই কর্মযোগ। ভক্তিযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা এবং তার দ্বারা নিজের দেবত্বের উপলব্ধি। মনঃসংযমের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধিকে বলে রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি হলো জ্ঞানযোগ। এই পথগুলো বিভিন্ন হলেও তারা কিন্তু সব একই কেন্দ্রের দিকে চলেছে। আর সেই কেন্দ্রের নাম ভগবান। মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'আমার সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল।' তাই স্বামীজি ১৮৯৫ সালের একটি চিঠিতে গুরু সম্বন্ধে জানাচ্ছেন, 'তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য স্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন।' ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সকলের কাছে। মানুষ যখন যে অবস্থাতে আছে সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাকে সাহায্য করতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না। তখন ধর্ম শুধু কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মতবাদ হিসেবে থেকে যাবে। ধর্মের সাহায্যে যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করতে হয় তবে ধর্মকে এমন হতে হবে যে মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখানেই তার সাহায্য পেতে পারে। দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চ শিখরে ধর্ম যেন সবসময় সমান ভাবে মানব জাতিকে সাহায্য করে।

ধর্ম বলতে স্বামীজি কতকগুলো শাস্ত্র পাঠ বা তত্ত্বকথাকে বোঝাননি। এমনকি কোনো মতবাদও যে ধর্ম নয় তা তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা বা যুক্তি-বিচারের মধ্যেও প্রকৃত ধর্ম নেই। স্বামীজির মতে ধর্ম মানে 'হওয়ার চেষ্টা করা' বা 'হয়ে যাওয়া'! যতক্ষণ না আমরা প্রত্যেকেই 'ঋষি' হচ্ছি, যতদিন না প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক সত্যেকে মুখোমুখি দেখছি, ততদিন আমাদের ধর্ম জীবন আরম্ভ হয়নি বলেই জানব। গীতায় বলেছে : সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।/ ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই জন্য তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদের উপলব্ধি করতে বলছে যে অন্যকে হিংসা করতে গিয়ে তুমি আসলে নিজেকেই হিংসা করছ। কারণ তারা সকলেই যে তুমি। ধর্মের এই শাশ্বত ভাবনাটির মধ্যে স্বামীজি জগৎকে যেন এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন। যেখানে সমস্ত মানুষ ও প্রাণী একে অপরের শুভ শক্তির দ্বারা পরিচালিত। ১৮৯৫ সালের মে মাসে আমেরিকা থেকে স্বামীজি খেতড়ির মহারাজকে একটি পত্র লিখছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, 'অজ্ঞান অসাম্য ও বাসনা–এই তিনটি মানবজাতির দুঃখের কারণ, আর উহাদের মধ্যে একটির সহিত অপরটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষ নিজেকে অপর কোন মানুষ হইতে, এমনকি পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবে কেন? বাস্তবিক সর্বত্রই তো এক বস্তু বিরাজিত। 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।'... তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমি কুমারী।' স্বামীজির মতে এই সমত্বভাব লাভ করাই সমগ্র সমাজের, সমুদয় জীবের ও সমগ্র প্রকৃতির আদর্শ।

ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা–প্রতিমুহূর্তে সাড়া দিত স্বামীজির অন্তরে। তিনি চেয়েছিলেন, 'আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজের নবকলেবর রচনা। শিক্ষা ও গণজাগরণ ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়; আর চাই নারীসমাজের উন্নতি।... আমরা পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে যাইব স্বাত্মস্থ হইয়া এবং বিনিময়ে তাহাদিগকে কিছু শিখাইব।' (স্বামী গম্ভীরানন্দ। 'নবযুগধর্ম'।)। বিবেকানন্দের এই শিক্ষা জাতির প্রতিরক্তবিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আজ কত রূপেই না তা আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের যেকোনো সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে স্বামীজির বাণী। স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে আরম্ভ করে ভারতের সকল প্রদেশের মনীষীরা সকলেই একথা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বামীজির বাণীকে নিজের জীবনে কাজে লাগালেই আমরা সমস্ত রকম অভিঘাত আর সমস্যার সংকট থেকে মুক্তি পাব। সর্বজনগ্রাহ্য উদারতায় ভরা তাঁর বাণী শুধু দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; তা সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত যুগের পরম আশ্রয়। •

তথ্য ঋণ

১. পত্রাবলী : স্বামী বিবেকানন্দ
২. নবযুগধর্ম : স্বামী গম্ভীরানন্দ
৩. স্বামী বিবেকানন্দ : জীবন ও বাণী
৪. স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ ভাষান্তর : স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার
৫. ভারতে বিবেকানন্দ
৬. আমার ভারত অমর ভারত
৭. আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী
৮. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী
৯. সামাজিক প্রথা ও বঙ্গনারী উনিশ শতক : নিখিল সুর
১০. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন : ১৯৩৩-১৯৮৩ : সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ।
১১. উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও নারীমুক্তির উন্মেষ (গবেষণা পত্র) গবেষক : গার্গী মজুমদার
১২. এবং মহুয়া : সম্পাদক : ডা. মদনমোহন বেরা। আগস্ট, ২০২১
১৩. দেশ : সম্পাদক : হর্ষ দত্ত। ২ জানুয়ারি ২০১৩

অভিজিৎ দাশগুপ্ত
প্রাবন্ধিক

অন্য গ্রীষ্ম

ই সন্তোষ কুমার

অনুবাদ : তৃষ্ণা বসাক

মালয়ালম ছোটগল্প

পূর্ব প্রকাশের পর...

'ওহ মাস্টার মাস্টার! তুমি না...' সে পার্সটা নিয়ে ক্যাজুয়ালি খুলল, তারপর বলতে থাকল 'চুক চুক চুক। আমি কি বলেছি পার্স খুলে দেখিয়ে আমাকে কনভিন্স করতে? ঠিক গ্রামের লোকদের মতো। বাড়ি থেকে বেরোলে তারা শুধু লোক দেখায়'

'আমি সত্যি কথাই বলি' রঘু বলে

'এই যে রেখে দাও' সে পার্স ফেরত দিয়ে খেলুড়ের মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আজকাল কেউ ক্যাশ ক্যারি করে না, তাই না? সব কার্ড আর নেট। এই যে, এই যে কার্ড, এতে কিছু আসছে তো, নাকি? নাকি নাম কা ওয়াস্তে?'

'আরে, কেবল ফাজলামি। এই কার্ডে টাকা আছে। চিন্তা করো না। ড্রাগন চিকেনের অর্ডার দাও।'

'কেন অর্ডার দেবো?' সে খুশিতে হেসে উঠল 'যখন একটা সত্যিকারের ড্রাগন আমার পাশে বসে আছে, তাই না?'

যেন খুব মজার একটা জোক শুনেছে এমনভাবে রঘু হেসে উঠল

বিল দেওয়ার পরেও আরও খানিকক্ষণ ওরা পাবে বসে রইল

'আচ্ছা বলো, শুধু ড্রাগন খেয়ে সময় কাটানো, এইভাবেই দিনটা চলে যাবে? আমরা কি একটু মজা করব না?' সে জিগ্যেস করল

'নিশ্চয়, আমি তো জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে তোমার প্রোগ্রাম কী? তুমি কি জায়গাটা চেনো?'

'না' রঘু বলল

'কোথায় থাকো? হোটেলে?

'না, একটা বন্ধুর সঙ্গে...' রঘু মিথ্যে করে বলল

'তাহলে একটা ঘর নেওয়া যাক' সে প্রস্তাব দিলো

'কোন হোটেলে? হ্যাঁ নেওয়া যাক।'

'না, সেটা না করাই ভালো।' সে বলল 'পরে তা থেকে সমস্যা হতে পারে। আমাকে অনেকে চেনে। আমি এখানে কাজ করি, তাই না?

'কাজ?'

'নয়তো কী? তুমি কি ভাবছ আমি ড্রাগন আর বিয়ার খেয়ে বাউণ্ডুলে জীবন কাটাই? হলে তো ভালই হতো। দেখো, আমি একটা কল সেন্টারে কাজ করি। আট বছর ধরে।'

'ওকে, তাহলে হোটেল না' রঘুর গলায় হালকা হতাশা ফুটে উঠল।

'ওহ, আমাকে কেউ দেখে ফেললে বাজে ব্যাপার হবে না?'

'তাহলে আমরা এখন কী করব?' রঘু ওর দিকে তাকাল।

'ওহ জিগ্যেস করতেই ভুলে গেছি, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম? পরে জানলেও চলবে? তোমার নাম কী?'

রঘু একটু থমকাল। নাম বলার কোনো দরকার নেই। আসল নাম তো কোনমতেই নয়। রঘু নন্দন-র বদলে যদি রঘু রামন বলে? তারপর যেন অন্য কিছু ভেবে সে বলে 'রামন, রামাচন্দ্রণ।'

সে হাসিতে ফেটে পড়ল। 'সবাই যখন এই অবস্থায় আসে, প্রত্যেকের এই নামটাই হয়, রামন। সব ভারতীয়দের একটাই নাম রামন' মনে হচ্ছিল কেউ ওকে কাতুকুতু দিয়েছে।

'তোমার নাম কী?'

'সীতা' সিরিয়াস গলায় বলে মেয়েটা। এখন রঘুও হাসে।

পাব থেকে বেরিয়ে এসে মনে হলো রোদের হলকা আরও বেশি। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে রঘুর চোখ কুঁচকে গেল। রাস্তায় ভিড় বেড়ে গেছে। তারা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল।

'যদি তাই হয় রামেতা, সরি সরি রামন, হ্যাঁ রামন, একটু অন্যভাবে ভাবা যাক। কেনো হোটেল বা রিসর্টে যাবার দরকার নেই। ওরা গুচ্ছের টাকা নিংড়ে নেবে। ওসব দরকার নেই। হাঁটা পথেই একটা বাড়ি আছে, আমি জানি। আমার এক বন্ধুর একটা ঘর আছে সেখানে। সে কখনো সখনো আসে। আমার কাছে একটা চাবি আছে। সেখানে গিয়ে রেস্ট করলে কেমন হয়?

রঘু ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে আমার সঙ্গে এসো। ওখানে অনেকে ঘুরঘুর করবে। ওদের পাত্তা দিয়ো না। তুমি আমার পেছনে এসো। আমরা কেউ কাউকে আর চিনি না, ঠিক আছে? দুজন অচেনা লোক আলাদা আলাদা ভাবে বাড়িটায় ঢুকবে। ঠিক আছে তো?'

রঘু আবার ঘাড় নাড়ে।

'হ্যাঁ বলতেই হবে। রাজি না থাকলে সোজা ফিরে যাও। বিয়ার আর ড্রাগন চিকেনের জন্যে ধন্যবাদ। এবং তোমার বন্ধুত্বের জন্যে।'

'আমি যাব।'

'তাহলে আমাকে একটা ৫০০ টাকা দাও।'

রঘু মেয়েটার দিকে অনিশ্চিতভাবে তাকাল

'এটা আমার ফি' মেয়েটা বলল

'ফি!' রঘু এক মুহূর্ত দোনামোনা করে।

'তাহলে কী ভাবছ? পাঁচশ টাকা। আমি তোমার কাছে বেশি নেব না। কিন্তু তোমাকে আগাম দিতে হবে। পুরুষমানুষ নিজের চাহিদা মিটে গেলেই পালিয়ে যায়। ওদের বিশ্বাস করা যায় না। 'সে হাসতে হাসতে বলে 'আর পাঁচশ টাকার জন্য পার্স থেকে সব বার করার দরকার নেই। সবাই আমার মতো নয়। কেউ দেখলে ছিনিয়ে নেবে।'

বাধ্য ছেলের মতো রঘু নিজের প্যান্টের পকেট থেকে একটা নোট বার করে ওকে দ্যায়।

'গুড বয়' ওর গালে টোকা দ্যায় মেয়েটা। 'না গুড রামন'

মেট্রো স্টেশনে যাবার রাস্তার আগেই মেয়েটা বাঁদিকে ঘুরে যায়। ছোট রাস্তা। রাস্তায় উপচে পড়া দোকান, ফুটপাথে হকার, গরু ছাগলের সারি। সে দেখছিল এক পা হাঁটলেই কেমন শহরের চরিত্র বদলে যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ লোকের ভিড়। মুচির সামনে, বাসনের দোকানের সামনে, দেশি ওষুধের দোকানে, পুরনো বইয়ের দোকানে... সে ওদের দিকে একবারও না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। রঘু ভাবল মেয়েটা নিজের হাতের তালুর মতো গলিঘুঁজি চেনে।

সে ওর পেছন পেছন হাঁটছিল। কিন্তু একজায়গায় এসে ওকে হারিয়ে ফেলল। সে ওর খোঁজে রাস্তার দুধার দেখল। পেছন ফিরে দেখল। শেষ অব্দি সে সামনে হাঁটতে থাকল 'যা হবে দেখা যাবে' ভেবে কিন্তু বেশ খানিকটা হেঁটেও ওকে দেখা গেল না। সন্দেহ গাঢ় হলো। সে এই শহরের অনেক মেয়ের গল্প শিনেছে, যারা পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, মদ আর খাবার খায়, তারপর কিছু টাকা হাতিয়ে উবে যায়। তারা এমনিতে চাকরি ঠিকই করে, কিন্তু এইসব করে আরও শানদার ভাবে থাকার জন্যে। কিছু এসে যায় না। অন্তত সান্ত্বনা আছে কেউ তার এই বোকামির কথা জানে না। যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরে যাবে ঠিক করল সে।

'এই যে স্যার, এদিকে' মেয়েটা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে। হ্যাঁ ওই মেয়েটাই তো। একটা বড় বিল্ডিং-র সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

বাড়িটা খুব পুরনো। চিড় ধরা দেওয়ালে সজেটে শ্যাওলার ছপ। তিনটে তলার জানলাগুলো বাড়ানো হাতের মতো বেরিয়ে আছে। কয়েকটা কব্জা থেকে ঝুলছে, নিচের ছোট্ট উঠোনে সামনের দিকটায় কয়েকটা পুরনো গাড়ি। বেশিরভাগই ভগ্নাবশেষ। অনেক গাড়িরই টায়ার নেই। মনে হয় যেন বাতিল গাড়ির জায়গা।

সে ভেতরে ঢোকার পর মেয়েটি আস্তে আস্তে বলল 'এই যে, আমাদের রাস্তা এর পেছন দিক দিয়ে। আমি চলে যাবার খানিক পরে তুমি এসো। ইতস্তত করবে না। দেখবে কিছু লোক ঘোরাফেরা করছে। ওদের পাত্তা দেবে না।'

সে ঘাড় নাড়ল। বিয়ারের প্রভাব আস্তে আস্তে কমে আসছিল। পুরো ব্যাপারটা যে এড়িয়ে যাওয়া উচিত এমন ধারণা মনের কোণে উঁকি মারছিল।

চলে যাচ্ছি বললে কেমন হয়? নিক গে ৫০০ টাকা। কিছু যায় আসে না। ওকে আর চোরের মতো ফলো করা যাচ্ছে না।

কিন্তু তখুনি ওকে ছোঁয়ার অনুভব ফিরে এল। ওর সুগন্ধি, নরম শরীর, রঘুর বুকের ওপর খেলা ওর সরু সরু আঙুল, টি-শার্টের ফাঁক দিয়ে দেখা ওর সুগঠিত স্তন,... রঘু ওকে আস্তে আস্তে নরম পায়ে বেড়ালের মতো অনুসরণ করল। বাড়িটার পেছনে বোতল, পুরনো জং ধরা ধাতব টুকরো, ভাঙ্গা কলসি ডাঁই করা। পেচ্ছাপের ঝাঁঝালো গন্ধ ওকে ঘিরে ফেলল। পুরো জায়গাটাই পরিত্যক্ত মনে হলো।

বাঁদিকে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ছিল। মেয়েটা সিঁড়ির নিচে পৌঁছল, ওখানে অন্য কারো গলা আসছিল। রঘু সিঁড়িটার কাছে গেল।

তিনজন যুবক, কিংবা মাঝবয়সীই হবে হয়তো, সিঁড়ির নিচের ধাপে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। ওরা থেকে থেকে কথা বলছিল আর হাসছিল। রঘু খেয়াল করল এটা অন্য কোনো ভাষা। দাড়িগোঁফ কামানো বেঁটে তিনজন লোক। তিনজনের চেহারায় চাইনিজ রেস্তোরায় বেয়ারার কাজ করা উত্তর পুবের ছেলেদের ছাপ।

ওদের মধ্যে একজন একটু সরে ওকে ওপরে ওঠার রাস্তা করে দিল। এটুকু ছাড়া ওকে ওরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। মনে হলো ওরা সিগারেট ফোঁকা আর তামাশায় মেতে আছে। মেয়েটা সিঁড়ির বাঁদিকের একটা ছোট ঘরের শাটার তুলছিল। শাটারটা তুলে সে নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

'এসো, ঢুকে পড়ো।' সে বলল। সেও নিচু হলো ওকে অনুসরণ করে। নিচে ওই ছেলেগুলোর কথা হাসি তখনো ও শুনতে পাচ্ছিল।

সে পুরো ভেতরে চলে এলে, মেয়েটা শাটার নামিয়ে দিলো। হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। সে কিছুক্ষণ অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল, একদম কাছের কিছুই ও দেখতে পাচ্ছিল না।

তারপর ও শাটারের নিচে চাবি দেওয়ার শব্দ শুনল।

'এর মানে কী?' রঘু জিগ্যেস করে।

'জাস্ট লক করে দিলাম, ঘাবড়িও না। যাতে অন্য কেউ উঁকি না মারে তাই।'

'আলো নেই?' সে হাতড়িয়ে বলল।

'কীসের জন্য আলো লাগবে?' সে আবার হাসল। 'এ ঘরে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই নেই।'

ওর প্যানিক হচ্ছিল।

'চিন্তার কিছু নেই। আমি ঠিক করে দিচ্ছি' মেয়েটা একটা জানলা খুলল। এক চিলতে আলো এসে অন্ধকারকে দুভাগ করে দিলো। আবছা আলোয় ও চারদিকে দেখল। ঘরটা ছোট। এক কোণে একটা পুরনো খাট, ওপরে তোশক বালিশ আর কোঁচকানো চাদর। ছোট একটা টেবিলে এক প্যাকেট মোমবাতি। কয়েকটা ভাঁজ করা পোশাক। একটা অর্ধেক দেওয়াল দিয়ে ঘরটা দুভাগে ভাগ করা। অন্য দিকে আরেকটা ঘর। বাথরুম হতে পারে। সেখানেও আলো নেই। পেচ্ছাপের গন্ধ আসছে।

'হেঁটে ক্লান্ত' গলায় অমোঘ দুষ্টুমি মিশিয়ে বলে সে। 'ওহ, এই কাজের জন্যে ছেলেরা তো যেকোন অন্ধকার গর্তে যেতে পারে, তাই না?'

রঘু ওর দিকে বোকা বোকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

'শোনো, এখান দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকার সময় নেই। যে উত্তেজনা নিয়ে তুমি মেয়েগুলোকে হাঁ করে গিলছিলে, সেটা কোথায় গেল? ভালো ছেলের মতো জামাকাপড় খুলে ফেলো।'

সে দ্বিধা করছিল।

মেয়েটা ওর কাছে এসে দক্ষ আঙুলে ওর শার্টের বোতাম খুলল। জিপার টেনে ট্রাউজার্স খুলে ফেলল। অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে সে নিজের বুকে হাত আড়াআড়ি করে রেখেছিল, যেমন বাচ্চারা রাখে।

মেয়েটা শার্টের পকেট থেকে ওর সেল ফোন বার করে খুঁটিয়ে দেখল 'আরে নতুন ফোন বস, স্মার্ট ফোন, তাই না?' সে নিজের হাতের পাতায় রেখে এমনভাবে দেখল যেন ওজন করছে। তারপর সাবধানে টেবিলে রেখে দিলো। এর পর ট্রাউজার্সের পালা। দুটো পকেটই চেক করল। পার্সটা দেখে সেটাও টেবিলে রেখে দিলো।

তারপর সে আস্তে আস্তে শার্ট আর ট্রাউজার্স দুটো রোল পাকিয়ে একটা গোলা করল। তারপর অর্ধেক দেওয়ালের ওপর দিয়ে অন্য দিকে ছুড়ে দিলো।

ঠিক তখনি সে বুঝতে পারল সে ফাঁদে পড়েছে। নেশার শেষ তলানিটা তার শরীর থেকে বেরিয়ে গেল।

'তুমি রমন নও, তুমি শুধু দিনের রমন, কিন্তু আমার দিনের রমন হে, তুমি বাপু বড় কিপ্টে। বলতে বাধ্য হচ্ছি। এইরকম একটা বড় শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছ পকেটে মাত্র ৩০০০ টাকা নিয়ে... ছিঃ আমারই লজ্জা করছে। কিন্তু আমার মন বলল তুমি ঝামেলা করার লোক নও, তাই জন্যেই তোমাকে এখানে আনলাম। যাই হোক, কিছু এসে যায় না।'

'আমি তোমাকে সত্যিই বলেছি' রঘুর গলা কেঁপে গেলো 'কুল কুল মাই ডিয়ার। এটা কোন বড় ব্যাপার নয়। যেকেউ মিথ্যে বলতে পারে। মিথ্যেও সত্যি। মিথ্যে বলা আসলে সত্যি বলারই একটা অন্য কৌশল। আর তুমি তো ছোট্ট মিথ্যে বলেছ।'

'কী মিথ্যে?'

'মিথ্যে এই যে... তোমার নাম রঘুনন্দন, তাই না?

'কীভাবে...কীভাবে' রঘু তোতলাতে লাগল 'তুমি কি সত্যি আমাকে চেন?'

'এই একেবারেই না। তাহলে কথা হলো কীভাবে জানলাম। খুব সোজা। এটিএম কার্ডে তোমার ছাড়া কার নাম ছাপা থাকবে? আমি সেটাই দেখেছি'

'শোনো, আমার কোনো ক্ষতি করো না প্লিজ। আমার পার্সে যা পড়ে আছে সব তুমি নিয়ে নিতে পারো। কিন্তু আমার জামাকাপড়।। প্লিজ ওগুলো ফেরত দাও। আমি চলে যাব। প্লিজ...'

'না না, এই, আমি কারো ক্ষতি করি না। এখানে এত কষ্ট করে এলাম কী জন্যে? জেগে ওঠো পুরুষ। আমরা মজা করার পরই এখান থেকে যাব।'

সে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার কথা হারিয়ে গেছিল।

মেয়েটা ওর পার্স খুলে ভেতরের সব জিনিস দেখাল। 'মনে হয় ৪০০ টাকার মতো পড়ে আছে। ব্যস। এটা আমার জন্য যথেষ্ট নয়। এই শহরে চালানো সত্যি কঠিন। চারদিকে টাকা উড়ছে। এত অল্প টাকায় খুব সাদামাটা ভাবে বাঁচাও সম্ভব নয়। কে এত কৈফিয়ত শুনতে চায়?'

মেয়েটা পার্স থেকে এটিএম কার্ড বার করল। 'এই কার্ডে কি কিছু টাকা আছে রঘু নন্দন? পিন কত?'

সে সুনন্দার কথা ভাবল। ওর চিকিৎসার জন্য মোটা টাকা ব্যাংকে জমা করা আছে। এই মেয়েটার হাতে পড়লে সব টাকা বার করে নেবে। রঘু ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'এই যে, মুখ খোলো। এতক্ষণ অব্দি ব্যাপারটা তোমার আমার মধ্যে আছে। এখুনি এটা মিটে যাবে। কিন্তু তুমি যদি পিন না দাও, অন্যরা ঢুকে পড়বে। দেখলে না তিনটে বখাটে সিঁড়িতে বসে আছে। শুধু খেতেই আছে। চেহারাও তাগড়া। সত্যি বলতে কি আমি ওদের পছন্দ করি না। কিন্তু এইরকম জায়গায় তুমি যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে চাও, তবে এইসব রাসকেলদের একটু সহ্য করতেই হবে। আর কোনো উপায় নেই। পিন নম্বর বলো।'

ও বিড়বিড় করে একটা চার অংকের নাম্বার বলল

'ওকে' মেয়েটা একবার নম্বরটা আওড়ে নিয়ে বলল 'শোনো মাস্টার, আবার ভুল বলছ না তো? যদি এই নম্বরটা ভুল হয়, তবে তিনবার ট্রাই করার পর কার্ড লক হয়ে যাবে। তারপর ঠিক হওয়া অব্দি ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ তোমাকে এখানে থাকতে হবে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা টাকা না পাওয়া অব্দি তুমি এখান থেকে বেরোতে পারবে না। আমার ভীষণ টাকার দরকার। আর যদি আমি ছেড়েও দিই, ওই যে বামনগুলো ওখানে বসে আছে, ওরা তোমাকে যেতে দেবে না।'

সে ইতস্তত করে বলল 'নম্বর টা ভুল।'

'তাই মনে হয়েছিল' মেয়েটা হাসল 'কিছু এসে যায় না। ভুল হলে কী হবে তোমাকে বুঝিয়ে বললাম। এখন ঠিকটা বলো'

রঘু ঠিক নম্বর বলে ওর দিকে ঘেন্না নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

সে কার্ড নিয়ে জানলার কাছে গিয়ে জোরে ডাকে 'এই কিশোর, এই কার্ড নে, পয়সা তুলে তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

লোকটার জন্যে অপেক্ষা করে তারপর এলে তাকে কার্ড দিয়ে বলে 'দেরি করিস না কিশোর। এদিক ওদিক ঘুরে গাঁজা খেয়ে সময় নষ্ট করিস না। সাহেবকে জলদি ফিরতে হবে।'

হয়তো দু'পা গেছে, আবার মেয়েটা ডাকে 'কিশোর পুরো টাকা তুলিস না যেন। কিছু রাখিস। মিনিমাম ব্যালেন্স। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমাকে রসিদ দেখাস। কিছু উল্টোপাল্টা করলে আমি কিন্তু ছাড়ব না।'

সে রঘুর কাছে এসে বলে 'অকর্মার ঢেঁকি সব। সারাদিন বসে গাঁজায় বোম হয়ে থাকে। কোনো কাজ করে না। আফটার অল দালাল সব। দালালদের স্ট্যান্ডার্ড তো জানো।'

সে ওর কাছ ঘেঁষে এসে বলতে থাকে 'সত্যি বলতে কি এগুলো এমনকি পিম্পও নয়। সেটাই মজা। আমার শিকার আমাকেই খুঁজতে হয়। এগুলো হচ্ছে জিভ চাটা কুত্তা। ভাবি কেউ থাক কাছাকাছি, রেখে দেই। এমন নয় যে ওদের আমি একটুও পছন্দ করি।'

সে ওর গালে চুমু খায় , বলে 'আররে, তুমি তো একদম ঠান্ডা মেরে গেছ! ভয় পেয়েছ? কোনো তাড়া নেই। ও টাকা নিয়ে ফিরে এলে আমরা মস্তি করব।'

সে শরীর থেকে সরে এসে বুকের ওপর আঙুল চালাচ্ছিল। রঘুর মনে পড়ল পাবেও ও এমন করেছিল। তখন ওর লম্বা আঙুলগুলো ওর মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছিল। •

তৃষ্ণা বসাক
কবি ও অনুবাদক

অলংকরণ : মিজান স্বপন

ধারাবাহিক উপন্যাস

বকেয়া হিসেব

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বকেয়া হিসেব

অজানা নম্বর থেকে বারংবার আসা ফোন তছনছ করে দেয় একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালি। অভিনয় ও মডেলিংয়ের আগ্রহ ওঠে কাঠগড়ায়। চলে দুই বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে চাপান উতোর তাদের কন্যার ভবিষ্যৎ গড়া নিয়েও। এক সুন্দরী বিদুষী নারীর স্বপ্ন পূরণের তাগিদে বিপদ আমন্ত্রণ, না এক ইন্টেলিজেন্স আধিকারিকের পেশা ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জটিলতা, নাকি এক নিষ্পাপ শিশুর মা-বাবার কৃতকর্মের ফল ভোগ? কিন্তু কে বকেয়া হিসেবের খাতা খুলে বসে আছে? ব্যাস্, এটুকুই সুতো ছাড়া রইল। বাকিটা নিজেরাই আবিষ্কার করুন পাঠক–কীভাবে কল্পিত খলনায়ক ও কাল্পনিক গোয়েন্দা আর অহেতুক রহস্যের অযৌক্তিক জাল ব্যতিরেকে একেবারে বাস্তব সমাজ রাজনীতি কূটনীতি থেকে তুলে আনা বিষয়, আইবি, সন্ত্রাসবাদ, ফিল্মজগতের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের রসায়ন পরতে পরতে ঘনীভূত হয়েছে। লেখিকা মনে করেন, বাস্তব হলো কল্পনার চেয়েও রহস্যময়। 'বকেয়া হিসেব' সেই রহস্যাবৃত বাস্তবকে আশ্রয় করেই।

কিন্তু সে তো আভাস আচাজ্জি নামে কোনো অফিসারের বৌ সেজে ঘর করছে। তাহলে বস্তায় কে? বডিটা গিয়ে দেখে আসবে? সালমাকে ফোন করল রোমিলা।

'হ্যাঁ রোমিলাদি বল। কীসের খবর? কাগজে বেরিয়েছে? তাই? এসব তো আজকাল আকছার হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ভাই। আমার তো কেমন ভয় করছে। ডেটটা দেখেছ, ঠিক নূপুর যবে থেকে লাপাত্তা তারপরে পরেই খুন হয়েছে। তুমি, আমি, দিলারা গিয়ে একবার দেখে আসি চলো।'

'তোমার যেমন বুদ্ধি। কী না কী খবর বেরিয়েছে, অমনি ছুটতে হবে। ডলি কি শুধু নূপুর ম্যাডামের নাম? কত ডলি আছে তার লেখাজোখা আছে? রমেশজির লোক নূপুরকে নিজের চোখে আইবি অফিসার আভাস আচাজ্জির বৌ বলে ডিটেক্ট করেছে। বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখে দেখবে চলো। মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে দারুণ চেকনাই এখন নাকি তার!'

'তবু দেখে আসতে দোষ কী? আচ্ছা নূপুরের গায়ে কোনো উল্কি ছিল, বাংলায় ডলি লেখা?'

'উল্কি একটা–উল্কি? আমি নূপুর ম্যাডামকে কতবার তেল মাখিয়েছি। কোনোদিন কোনো উল্কি দেখিনি তো

আকাশে ওড়ার আগে আভাসের একবার ফোন করার কথা। এখনো করছে না কেন? বিমান কি দেরিতে ছাড়বে? সংযুক্তা ফোন করবে বলে মোবাইল হাতে নিতেই সেটা বেজে উঠল। পর্দার দিকে লক্ষ না করেই বোতাম টিপে ফোন ধরে বললো, 'কী হলো, ফ্লাইট দেরি করেছে?' 'ভালো আছ নূপুর? হাজব্যান্ড ট্রান্সফার হয়ে গেছে?'

তুমি কিন্তু অযথা ভয় পেয়ে বিশাল রিস্ক নিতে চাইছ। আমাদের কি আগ বাড়িয়ে পুলিসের মুখোমুখি হওয়া উচিত? কেন এসেছি, ডলি কে আমাদের, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি বেফাঁস কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে যায়? না গেলেও পুলিস আসল ক্রিমিনালদের না পেয়ে তোমাকে আমাকেই হয়তো ফাঁসিয়ে দেবে। তোমার মাথা একেবারে গেছে রোমিলাদি।'

রোমিলা ফোন রাখতে সালমা নিজেকে আয়নায় দেখল। এতদিনে একটা সংগঠন, একটা কারবারের সর্বেসর্বা হতে চলেছে। চিরকাল অন্যের অধীনে থাকতে ভালো লাগে? তাও ম্যাডাম ইদানীং উল্টোপথে চলে সালমাদের জানা তৈরি কাজটায় ব্যাগড়া দিতে চাইছিল। রমেশ প্রধান নিজের কথা রেখেছে। তাকে বিপদে পড়তে দেওয়া যায়? নূপুরের পিঠে উল্কির হদিস সালমা জানবে না তা হয়? তাই বলে জানলেই জানাতে হবে?

রমেশ আসলামকে ফোন করে নিজের কলকাতার ডেরায় ডেকে দরজা বন্ধ করে কথা বলছে। 'ইতনা কচ্চা কাম ক্যয়সে কিয়া? তুমহারে লোগোনে কিয়া, ইয়া কিসী অউর কো সুপারি দিয়ে থে?'

'কাম তো হমারি আপনি আদমিওঁনে কিয়া। পর কাম কচ্চা ক্যয়সে? বডি এক মাইনে তক পানিকে নিচে দফনা রহা। উস হরামিকে পিল্লোকো মছলি পকড়নে লিয়ে এক ওহী সড়া হুয়া ঝিল মিলা থা কেয়া? ফিরভি এক মাইনে পানিকে নিচে। বডি তো সড় ভি গয়া। কোয়ী সুরাগ নহী মিলনেওয়ালা।'

'ফরেন্সিক রিপোর্ট নাম কী এক চীজ হোতী হ্যায়। পতা হ্যায় না? অউর পুলিস চাহে তো উসকে লিয়ে নামুমকিন কুছ ভী নহী। সালীকো ইতনা টরচার কিয়া, আর ট্যাটু ইনট্যাক্ট ছোড় দিয়া ও ইডিয়েট লোগ?'

'ও ডলি নামকী তো বহুত সারে লড়কী হো সকতে। ওহী ডলি ইসকা কেয়া সবুত হেয়?'

'সবুত এয়সেহী নহী মিলতা। শকসে সবুত পয়দা হোতা। জানো কি রোমিলা সালমাকে ফোন করে ডেডবডি দেখতে যেতে চেয়েছে। সালমা কোনো রকমে ধামাচাপা দিয়েছে। কিন্তু রোমিলার মনে একবার খটকা যখন লেগেছে, সেটা রিস্কি হতে পারে। ইয়ে শক দূর ভগানা হেয়। অব বারি হেয় দুসরী নূপুরকী। জিতনা জলদি হো সকে উসকা কাম তমাম করো। রোমিলা, দিলারা ইয়ে লোগোঁকো ইয়েকিন হো জানা চাহিয়ে নূপুরকো আপনি কিয়ে কা সজা অব মিলা হেয়, এক মহিনে পহেলে নহী। সমঝ গয়ে? ইয়ে খবর রোমিলাওঁ তক পৌঁছানে কা জিম্মা মেরা, লেকিন সাবধান, পুলিসকে হাথ লগনা নহী চাহিয়ে। বডি একদমসে ভ্যানিশ হোনা চাহিয়ে। কামকা ভিডিও বনাকে রখনা। বেইমানির শাস্তি কী হয় আর এবারেরটাই যে নূপুর সেটা এদের বোঝাতে হবে। দিমাগমে বৈঠা লো, নূপুর এক হী শকস, যো ডবল এজেন্ট বনকর হমসে ধন্দা ভী করতী থী অউর পুলিস কো খবর ভী। নো সেকেন্ড নূপুর। তুমহারে লোগোঁকো ভী পতা নহী চলনা চাহিয়ে। দরকারে সুপারি দাও। দরকার মানে এটাই করতে হবে। রেপটেপ করে মারে যেন, তাহলে কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপকে চট করে সন্দেহ হবে না। আভাস আচারিয়াকে হয়তো যতটা চেয়েছিলাম তারচেয়ে বেশিই শাস্তি দেওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই। ওদের একটা বাচ্চা মেয়েও আছে। একদম মস্ত্। ও ভী রোমিলা কী কাম আ সকতী। রোমিলা খুশ হো জায়েগী।'

অনেক রাত পর্যন্ত আসলাম মিঞার সঙ্গে রমেশ প্রধান ওরফে অনুকূল রাজবংশীর বৈঠক চলল। দুজনেরই গোপন দেহরক্ষী বাড়ির বাইরে গোপনে থেকে পাহারা দিলো। কেউই অনুকূলের ডেরায় এল না। এমনকি রাতের খাবার খাওয়ার জন্যও নয়। তাদের খাবার পৌঁছনোর কথা একটি অল্প বয়সী মেয়ের। সে আবার তার যা শোনার নয় তাই শুনে ফেলেছে। ভয়ে বিভীষিকায় হাত পা ঠান্ডা অবশ হয়ে গেছে তার। দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে এখান সেখান ধাক্কা খেতে লাগল। সে নিরাপদে নিজের বাড়ি পৌঁছোলে হয়। আজ যদিও বা পৌঁছায়, কালকের কথা কে বলতে পারে?

বোকা মেয়ে, এমন কতই তো হয়। তোর সাথে হয়েছে কী? পালাবার কী আছে? অনেক কিছু দেখবি শুনবি; মনে রাখবি শিক্ষার জন্য, কিন্তু না শোনার ভানটা ভুলে গেলে চলে?

পণবন্দী হিয়া

ট্যাক্সি ছুটছে। অভিমুখ নেতাজি সুভাস বোস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। যাত্রী আভাস আচার্য্য। গন্তব্য নাগাল্যান্ড। বেরোনোর সময় ভীষণ কান্নাকাটি করছিল রিমি। হিয়াকে ভোলাতে গিয়ে নিজে যা শুরু করল। আভাস হাসি মুখে বলেছিল, 'আমি তো প্রতি মাসে আসব নাকি? চিন্তা কোর না। হিয়া, মাকে দেখিস আর দুষ্টুমি না করে মার কথা শুনিস। লক্ষ্মী সোনা আমার। দুজনকেই বলছি।'

সংযুক্তা অবাক আর হতাশ চোখে দেখছিল কর্তব্যপরায়ণ ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে। কর্মস্থলের প্রতি কর্তব্যবোধ এতটাই যে, আপনজনেদের জন্য কষ্টবোধও নেই। বৌ কাঁদছে, মেয়ে কাঁদছে। ওর চোখে জল না আসুক, হাসিটাই বা আসে কী করে? স্ত্রীর জন্য না হোক, সন্তানের জন্যও কোনো উদ্বেগ থাকবে না?

আকাশে ওড়ার আগে আভাসের একবার ফোন করার কথা। এখনো করছে না কেন? বিমান কি দেরিতে ছাড়বে? সংযুক্তা ফোন করবে বলে মোবাইল হাতে নিতেই সেটা বেজে উঠল। পর্দার দিকে লক্ষ না করেই বোতাম টিপে ফোন ধরে বললো, 'কী হলো, ফ্লাইট দেরি করেছে?'

'ভালো আছ নূপুর? হাজব্যান্ড ট্রান্সফার হয়ে গেছে?'

বুকের ভেতরটা এত জোরে ধড়াস করল যে, হিয়াও শুনতে পেল বোধহয়। ল্যান্ড লাইন নম্বর জানত, মোবাইল নম্বরও জোগাড় করেছিল। সংযুক্তা সেই নম্বর ব্লক করে দিয়েছে। অন্য নম্বর থেকে ফোন করছে। আভাস নেই, সেটাও জানে! তার মানে আভাসের বদলিরও খবর রেখেছে। এতদিন তক্কেতক্কে ছিল, আভাস বেরিয়ে যেতেই আবার শুরু করেছে। খবর যখন রাখছে, নজরও রাখছে না তো? সংযুক্তা যে ঐ রমেশ প্রধান না কে, তার টাকা মেরে দেওয়া নূপুর বা ডলি নয়, তা জেনেশুনেও কেন এমন করছে? সেদিন অডিশনের দিন ভাগ্যিস ছিল না। নাহলে ওরা মা-মেয়ে ফিরতে পারত কিনা সন্দেহ।

আবার পুলিসের কাছে যাবে? গতবারের অভিজ্ঞতা তো বলছে ফল অষ্টরম্ভা। ডায়রি নেওয়ার বদলে থানার মেজবাবু সংযুক্তার দেওয়া নম্বর দেখে ভুলভাল ডায়াল করে এক নিরীহ ব্যক্তিকে প্রচণ্ড কড়কে দিলো। সেই ব্যক্তি তারপর কতদিন ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছিল কে জানে? শেষ পর্যন্ত ওসি ডায়রি নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ফোন আসা বন্ধ হয়নি। খড়দা থানার বড়বাবু মেজবাবু ছোটবাবু কারও ঠিক নম্বরটিতে ফোন করার সময় হয়নি। শেষমেষ ল্যান্ডলাইনটাই কাটিয়ে দিলো আভাস।

তাছাড়া সেন্ট্রাল আইবিতে কাজ করে যে মানুষ, তার পরিবারকে এই ধরনের বিপদে দিনের পর দিন কেন পর্যুদস্ত থাকতে হবে? সংযুক্তা সেদিন নূপুরকে প্রত্যক্ষ করে আসার অভিজ্ঞতা আভাসকে জানালে পুরোটা মন দিয়ে শুনেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যে লোক নিজের পরিবারকে সামান্য উৎপেতে ফোন কল থেকে বাঁচাতে পারে না, অপরাধীকে ধরার কোনো উদ্যোগই নেয় না, কেবল ভয় পেয়ে ফোনের লাইন ছেড়ে দেয়, সে দেশের কী ঘণ্টার কাজ করবে?

কাগজের দিকে চোখ পড়ল। নদিয়ার একটি মন্দিরে বোমা আছে রটনার জেরে আবার বেশকিছু হতাহত। কিছুদিন আগে উড়িষ্যায় হয়েছিল। মাঝে বিহারের গয়াতে শোনা গেল। এখন আবার পশ্চিমবঙ্গে। একবার একটা অঘটন ঘটতে থাকলে দেখা যায় পরপর ঘটে চলেছে। কিন্তু

এবার সন্তোষীদিরও স্নায়ু মাত খেল। সে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে জানালো। সব জটলা করে বৃত্তান্ত শুনছে, কিন্তু কারও কাছে কোনো সমাধান নেই। কেউ হিয়ার স্কুলে যেতেও রাজি নয়। গিয়ে নাকি লাভ নেই। হিয়ার আসার সময় হয়ে আসছে। আভাসকে কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করে মোবাইলটা রেখে দিলো। যার ওপর ভরসা নেই, এখন তাকে ডাকা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। হুহু করে ডুকরে উঠল সংযুক্তা। কান্নাকাটি হইচইয়ের মধ্যেই শোনা গেল, 'এসে গেছে, ঐ তো! ঐ দেখো।'

এখন পদপিষ্টদের জন্য শিউরে ওঠার অবকাশ নেই।

লাইন কেটে আভাসকে ফোন করতে গেল। এতক্ষণ ওর ফোন আসেনি যখন, তখন হয়তো প্লেন ছাড়েনি এখনো। নট রিচেব্‌ল। তার মানে? ও আকাশে? সংযুক্তাকে ওড়ার আগে একবার ফোনও করল না? না না, ঐ তো চলভাষে মূর্ছনা! কিন্তু আভাস নয় তো, অন্য নম্বর! ধরতেই সেই কণ্ঠস্বর, 'ফোন কেটে দিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে? তোমার সোব খোবর আমি রাখি। মেয়ে সেন্ট্রাল অ্যাকাডেমিতে পড়ে না?'

ভেতরটা হিম হয়ে গেল। এবার যেন হৃদস্পন্দনও বন্ধ হয়ে গেল। হিয়া স্কুলে। ফিরতে একটু দেরি আছে। ওরা যদি হিয়াকে...

সংযুক্তা কেঁদে ফেলল, 'কত টাকা চাই আপনার? আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি করবেন না। ওর বাবা কিন্তু আইবিতে কাজ করে। আমাদের গায়ে হাত পড়লে কিন্তু..., কত টাকা চাই আপনার?'

'কত আর্মি কর্নেলকো ফুঁক ডালা, অর তুমি আইবি দিখাচ্ছ? আমার দস লাখ রুপিয়া চাই। ও ভি কালকের ভিতরে। দিতে পারবে?'

'দশ লাখ? অত টাকা কোথায় পাব? আমি আপনার নূপুর নই। আমি সংযুক্তা আচার্য্য।'

'হাঁ, আর আপনার মেয়ের নাম অবন্তিকা আচার্য্য, তাই না? ওর স্কুল দুটো পঁদরোতে ছুটি হোয় না? আমি যাব রিসিভ করতে? তারপর বিস লাখের ইন্তেজাম করবে।'

'খবরদার না। মানে প্লিজ না। আপনি তো বুঝতে পারছেন আমি নূপুর নই। তাহলে কেন আমাকে জোর করে নূপুর বানাতে চাইছেন? আমি...'

'তোর আডেন্টিটি আমি যা বলব তাই। বুঝলি? তুই সংযুক্তা, আবার নূপুরও, ফির ডলিও আছিস। বুঝলি?'

লোকটার স্পর্ধা এত দূর যে, সে সংযুক্তাকে 'তুই' করে কথা বলল। কিন্তু ভয়ে এসব মাথায় এল না। এক্ষুনি হিয়ার স্কুলে যেতে হবে। কিন্তু ও যেতে যেতে হিয়ার স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, ততক্ষণ তো স্কুলে থাকার কথা নয়। তাহলে? সংযুক্তার মাথা কাজ করছিল না।

সন্তোষীদি কাজ করতে এল। তার কাছে কেঁদে পড়ল। সন্তোষী আগে একবার শুনেছিল। এবার শুনে বলল, 'তুমি শিগগির স্কুলবাসে খবর দাও। ফোন নম্বর জানো তো? আর স্কুলে ফোন করে জানাও যাতে মেয়েকে বাসের লোক ছাড়া আর কারও হাতে না ছাড়ে।'

'সে তো এমনিতেই ছাড়ার কথা নয়। আমি কী করি সন্তোষীদি? ওর বাবাও বাড়ি নেই। আমি এখনই থানায় যাই? কিন্তু হিয়া বাড়ি ফিরে আসার মধ্যে ফিরতে পারব তো? কী করি? তুমি কাউকে খবর দিতে পারবে? কী সাংঘাতিক লোক দেখো, ঠিক লক্ষ রেখেছে, তোমার দাদা কবে কলকাতা ছাড়বে, হিয়া কোন স্কুলে পড়ে। আমরা এতদিন এসব ফাঁকা আওয়াজ ভাবতাম। কিন্তু হে ভগবান!'

'তুমি স্কুলে ফোন করো তো। এই দেখো, কেঁদে যাচ্ছে শুধু। কাঁদলে চলবে? বলো, তুমি নিজে আনতে যাবে, তার আগে যেন মেয়েকে স্কুলের জিম্মায় রেখে দেয়।'

'কিন্তু আমার যেতে যে দেরি হবে। নিজেদের গাড়ি তো নেই। অটো করে ট্রেনে করে পৌঁছতে যা দেরি হবে, হিয়াদের স্কুলবাস তার চেয়ে ঢের আগে বাড়ি হয়তো পৌঁছে যাবে, যদি না অন্যকিছু, হে ঈশ্বর! কী করি?'

'তালে স্কুলবাসের ড্রাইভার কি হেল্পারকে ফোন করো। শুধু কী করি, কী করি করলে চলবে?'

আবার ফোন বেজে উঠল, 'কী হোল নূপুর, টাকার ব্যবস্থা হোল? স্কুলবাসের হেল্পার কিন্তু আমাদের হেল্পার হয়ে যেতে পারে অ্যাট এনি মোমেন্ট।'

'আপনি তো কালকের মধ্যে টাকা দিতে বললেন। আজ আমার মেয়েটাকে কেন..? প্লিজ! আপনি কিছু করবেন না। আমি দশ লাখই দেবো যেমন করে পারি।'

'মেয়ের দাম দশ লাখ মাত্র? ওকে আমরা রিসিভ করলে তো বিশ দিতে হোবে। হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ।'

'তাই দেবো। কিন্তু ওকে ধরবেন না। প্লিজ। আমি ভিক্ষা চাইছি। আপনার যা টাকা লাগে আমি দেবো। লোকের কাছে ধার করে হলেও দেবো।'

স্কুলের নিজস্ব বাস তো নয়। প্রাইভেট বাস ভাড়া খাটে। লোকটা এতক্ষণ ধরে বকে যাচ্ছে যে, ড্রাইভার বা কিংকু ছেলেটা, কাউকেই ফোন করা যাচ্ছে না। কিংকুর হাবভাব মোটেই ভালো লাগে না বলে মেয়েকে বিশদে বোঝাতে না পারলেও সতর্ক করে। ওর পক্ষে অন্যের হাত হয়ে গিয়ে টাকার বিনিময়ে অপকর্ম করাটা আশ্চর্যের কিছু না। ওকে যেমন করে হোক আটকাতে হবে। টাকার লোভ দিয়ে হলেও। কিন্তু কিংকুর ফোন ব্যস্ত, অথবা বেজে বেজে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভার তো ফোন ধরেই না। কারণ বোধগম্য, কিন্তু হেল্পারের ফোন ধরতে অসুবিধা কোথায়? এর মধ্যেই কিংকু বেহাত হয়ে যায়নি তো? হে ঈশ্বর!

এবার সন্তোষীদিরও স্নায়ু মাত খেল। সে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে জানালো। সব জটলা করে বৃত্তান্ত শুনছে, কিন্তু কারও কাছে কোনো সমাধান নেই। কেউ হিয়ার স্কুলে যেতেও রাজি নয়। গিয়ে নাকি লাভ নেই।

হিয়ার আসার সময় হয়ে আসছে। আভাসকে কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করে মোবাইলটা রেখে দিলো। যার ওপর ভরসা নেই, এখন তাকে ডাকা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। হুহু করে ডুকরে উঠল সংযুক্তা। কান্নাকাটি হইচইয়ের মধ্যেই শোনা গেল, 'এসে গেছে, ঐ তো! ঐ দেখো।'

ছুটি

হিয়াকে দেখে সংযুক্তার যতটা বাঁধভাঙা আনন্দ হলো, আভাসকে দেখে ততটাই হতচকিত! মাটিতে থেবড়ে বসে মেয়েকে বুকে জাপটে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, 'সোনা মামাই। কাল থেকে তোকে স্কুলে আমি নিয়ে যাব, আর ছুটি না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকব।... আর তুমি? কোথা থেকে এলে? তুমি যাওনি?'

আভাস উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল।

'তুমি নিশ্চয়ই আকাশে ছিলে না। থাকলে এখন ফিরতে পারতে না। প্লেনে ওঠোনি যখন তাহলে ফোন ধরছিলে না কেন? তোমার মোবাইলও আউট অফ নেটওয়ার্ক বলছিল। আমি ভাবলাম...'

আভাস এবারও কিছু বলল না। ইঙ্গিতে সংযুক্তাকে শান্ত হতে বলল।

হিয়া বাড়িতে এত মানুষের সমাগম, মায়ের কান্না, এসবের কোনোটারই কারণ বুঝেই উঠতে পারছে না। শুধু বাবাকে স্কুলের অফিসে দেখে আর স্কুলবাসের বদলে অন্য গাড়িতে ফিরতে পেরে দারুণ খুশি। বাবা আবার বাইরে চলে যাচ্ছিল বলে সেও মন খারাপ করেছিল। কিন্তু বাবা কেন এবং কখন এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এল, তাই নিয়ে তার অত জিজ্ঞাসা নেই।

আস্তে আস্তে জনতার ভিড় সরে যেতে লাগল। পাড়া প্রতিবেশীরা নানা সদুপোদেশ দিয়ে যে যার কাজে বা বাড়ি গেল। তাদের সঙ্গে শান্ত হয়ে কথা বলেছে আভাস, যদিও পরিষ্কার করে কিছুই বলেনি। সংযুক্তার কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়নি, এদিক সেদিক করে এড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ওর দুবার ফোন এসেছে। সংযুক্তা এতক্ষণ ভিড়ভাট্টা উত্তেজনায় খেয়াল

করেনি। আশ্চর্য! এই একটু আগেও সংযুক্তা কতবার ফোনে চেষ্টা করছিল, আভাস বাড়িতে ঢোকার মিনিট দশেক আগে পর্যন্ত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর জানিয়ে যাচ্ছিল আভাসের চলভাষ পরিষেবা সীমার বাইরে; আর এখন নেটওয়ার্ক ফিরে এসেছে?

আভাস ফোন ধরে কাউকে নির্দেশ দিলো, 'সোজা কালীঘাট থানায়। এবার পোটায় অ্যারেস্ট হয়েছে। ননবেলেব্‌ল। সিন্‌হা সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে। উনি অ্যান্টিবেঙ্গল লবিবাজি করে আর অ্যান্টিন্যাশনালদের ছেড়ে দেবেন না। কালীঘাটের ওসি যদি সরকার থাকে তো ওয়েল অ্যান্ড গুড, সব স্মুথলি ব্যবস্থা হয়ে যাবে; কিন্তু সে নাও থাকে তাহলেও যেই থাক আমার সঙ্গে কথা বলিও। আমি আমার ফ্যামিলি সামলে আসছি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। বুঝতেই পারছ মিসেস কতটা আপসেট।'

'এই তো এলে, আবার কোথায় যাবে? আমাকে কিচ্ছু জানাবে না? আমি কোথাও গেলে কত কৈফিয়ত, কালেভদ্রে একদিন অডিশন বা শুটিংয়ে গেলে যদি তোমাকে সংসার দেখতে হয়, বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে যাও।' ফুঁসে উঠল সংযুক্তা। 'আর তুমি বাইরে গেলে? তখন তো আমাকেই একা থাকতে হবে মেয়েকে নিয়ে। শেষের বাক্যে রাগের চেয়ে অসহায়তা কাতরতা বেশি।

'আপাতত সেটা হবে না। আরও দুবছর আমি এখানেই থাকব। চাইনিজ চর কাম আর্মস্ সাপ্লায়ার ইউয়েন জং অনুকূল রাজবংশী নাম নিয়ে ত্রিপুরাসহ পুরো নর্থ-ইস্টে অপারেট করত। কলকাতায় ওর পরিচয় রমেশ প্রধান। সেই ছদ্মবেশে আর ছদ্মনামেই তোমায় ফোন করত। নূপুর ওর সঙ্গে টেরোরিস্ট সাপ্লাই দেওয়ার আর হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের কাজ করত। আরও অনেকে আছে। তুমি সব বুঝতে পারবে না। আসল নূপুর, মানে নূপুর আর ডলি নাম নিয়ে যে কাজ করত সে ইদানীং ননকোঅপারেট করায় তাকে মেরে ফেলেছে। কদিন আগে কাগজে পড়লে না, কেষ্টপুর খালে তরুণীর দেহ উদ্ধার। সেই হলো আসল নূপুর। আর...'

'ইস্! কী সাঙ্ঘাতিকভাবে মেরেছিল! আর আমার অপরাধ?'

'গেস করো।'

'আমি অনেকটা নূপুরের মতো দেখতে বলে?'

'এক্‌জ্যাক্টলি।'

'কিন্তু আমাকে জোর করে নূপুর বানিয়েই বা ওর লাভ কী? যার ওপর রাগ তাকে তো যাচ্ছেতাই টরচার করে শেষ করে দিয়েছে। এখন পৃথিবীতে তার মতো দেখতে সব মেয়েদেরই কি... সাইকো নাকি?'

'সাইকো ফাইকো নয়, ঠান্ডা মাথার সেয়ানা। তোমাকে নূপুরের ডামি সাজিয়ে অন্য পেটোয়াদের দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তারপর তোমাকেও লিকুইডেট, এনিওয়ে তবে শুধু তার জন্য তোমায় নূপুর বানানোর দরকার ছিল না। সে তো যে কেউ যে কোনোদিন মরতে পারে। আসল মোটিভটা ছিল আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। সিকিমে থাকতে আমি লোকটাকে স্পাইং করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলি। অ্যারেস্টও করেছিলাম। তারপর ওপর মহলের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। ওসব ইন্টারডিপার্টমেন্টাল কনফ্লিক্ট তুমি বুঝবে না। তা ছেড়ে দেই ঠিকই, কিন্তু আমার তাড়া খেয়ে পাহাড় থেকে খানিকটা নিচে পড়ে যায়। তাতে নিজের ডান পাখানা চিরদিনের মতো খোয়ায়। আমার কোলকাতার আনএক্সপেক্টেড পোস্টিংটা সেই সূত্রেই। তারপর থেকে লোকটা আমার পেছনে ঘুরেছে। এমনিতে বম্বব্লাস্ট খুনখারাপি, ডায়রেক্টলি অর ইনডায়রেক্টলি এসবই তো কাজ। এখন অত বোঝানোর সময় নেই। মোদ্দা কথা, যে আমার অ্যাবসেন্সে তোমাদের চরম ক্ষতি করার প্ল্যান করছিল তা আমরা জানতে পারি। আজ স্কুলের বাইরে সত্যিই হিয়াকে কিডন্যাপিংয়ের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। ফাঁপা বুলি নয়। আমি আমার টিম নিয়ে সময়মতো পৌঁছে যাই। তারপর প্রিন্সিপালকে জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে এই ফিরছি।'

'আমার কাছে র‍্যানসামও চাইছিল।'

'র‍্যানসাম দিলেও মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় ওদের ছিল না, উল্টে তোমাকেও ধরে আটক করত। বেশি এক্সপ্লেইন করার নেই। আমাকে আবার বেরোতে হবে।'

'না, তুমি কোথাও যাবে না।' হিয়া বাবার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'আমি কোথাও যাব না মামাই। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব। কিন্তু আজ যে আমাকে ডিউটিতে যেতেই হবে সোনা মামমাম।'

'আমাকে এভাবে সারপ্রাইজ দেওয়ার মানে? তোমার বদলি হচ্ছে না, এটা আমাকে জানাওনি কেন? বাড়িতে জানিয়েছ? আমি টেনশনে কেঁদেকেটে সারা। ঐসব ফোন আসার পর থেকে, মানে পাগলের মতো তোমায় ফোন করে গেছি। প্রতিবারই শুনেছি ফোন নট রিচেব্‌ল। অন্য যাকে পেরেছি তোমাকে কল করতে বলেছি। সবাই একই কথা বলেছে। আমি ভাবছি আকাশে বুঝি। মনে হচ্ছিল কেন প্লেনটা লেট করল না। আর এখন আবার দিব্যি তোমার ফোন আসছে! কী ব্যাপার বলো তো? আজ সকালে কোহিমার ফ্লাইট ধরবে বলে বেরোলে। আমার সঙ্গে এত লুকোচুরির মানে? এতদিন সব জেনেশুনে আমাকে অ্যাংজাইটি ভোগ করিয়েছে?'

'উপায় ছিল না। ওরা তোমার গতিবিধি নিখুঁতভাবে ফলো করছিল। তুমি যা পেট পাতলা, একবারও যদি টের পেত আমি নাগাল্যান্ড যাচ্ছি না, তাহলে ওদের প্ল্যান বদলাত, আর ওদের গ্যাংটাকে ধরতে পারতাম না। এমনকি মোবাইলের টাওয়ার ট্রেস করে ওরা আমার তোমার কথোপকথন হচ্ছে কিনা সেটাও টের পেত। ওদের জগৎ মানে আরেকটা প্যারালাল সরকার, সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। খোলাখুলি অপারেট করে না, এই যা। তাই আমার নির্ধারিত ফ্লাইটের সময় হবার পর মোবাইলে কারসাজি করে নট রিচেব্‌ল করে রেখেছিলাম। স্কুল থেকে তো ইউয়েনের একজন দোসর আসলামকে দুজন চেলাসহ ধরেছি। ইউয়েনকে টালিগঞ্জ থেকে ধরা হয়েছে। অনেক কাণ্ড। পরে এসে বলব। তুমি মেয়েকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুমোও দরজায় খিল দিয়ে। রাতে বাইরে ডিনার। চলেগা?'

'ইয়ার্কি? দুপুরে এসে না খেয়ে বেরোবে? আমিও না খেয়ে থাকব কিন্তু। অ্যাটলিস্ট কিছু তো মুখে দিয়ে যাও।'

'আমি ঠিক খেয়ে নেব। এখন সময় নেই। শয়তানটাকে কালীঘাট থানায় চালান করা হয়েছে। আমি গেলে ঠিকমতো কেস সাজানো যাবে না, কোনো ফাঁক গলে... আর ওর সঙ্গে আরও যে কতজন আছে... তার মানে আমাদের বিপদ থেকেই যাবে। সব মাথাগুলোর হাত পেয়েছি। তুমি হিয়াকে খাইয়ে খেয়ে নিও লক্ষ্মীটি। আমি সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরব। তারপর রাতে বাইরে ডিনার। আর তারপর... কটাদিন ছুটি নিয়ে নাগাল্যান্ডই বেড়িয়ে আসব। সঙ্গে অরুণাচল। প্রমিস।' •

সমাপ্ত

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মেদিনীপুর। পৈতৃক বসবাসসূত্রে শেকড় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার ডিশেরগড় খনি অঞ্চলে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (রসায়ন), বিএড, এমবিএ'র পর কর্মজীবন শুরু করেন ফার্মাসিউটিকল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে। বর্তমানে একাধিক বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, ছড়া, ফিচার, বই বা নাটক পর্যালোচনা ইত্যাদি রচনায় নিয়োজিত। পেশাদারিভাবে ইংরেজি কনটেন্টও লিখেছেন অসংখ্য। কবিতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শ্রীপর্ণার গদ্যসৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও ফিচারগুলো তাঁর মননের অন্যতম পরিচয়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদের জন্য পেয়েছেন বঙ্গ সংস্কৃতি পুরস্কার, ঋতবাক পুরস্কার, শর্মিলা ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, উষা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, নবপ্রভাত রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারক সম্মান, প্রতিলিপি বিশেষ পুরস্কার, রাজেশ সরকার স্মৃতি পুরস্কার, পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (মেঘদূত সাহিত্য পত্রিকা–সেরার সেরা সম্মান), ডলি মিদ্যা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, স্মৃতি ও চেতনা পুরস্কার, People Reflections Special Recognition, সোনালি ঘোষাল পুরস্কার (অনুবাদ) ইত্যাদির মতো নানা পুরস্কার।

সুলুকসন্ধান

পাপড়ি রহমান

ছোটগল্প

ওই যে ওই বছর–যে বছর যুইদ্ধ বান্ধিল, পাকিস্তানিদের খপ্পর থাইকে বাঁচনের জইন্য ধুন্ধুমার এক যুইদ্ধ, ওই বছরই তো আতাহার মিয়ার বয়স হইছিল সবে ষুল! আলেকজানবিবি নিজের হাড্ডি আর মাংশরে মণ্ড কইরে দিয়ে মানুষ করতেছিল একমাত্র ছাওয়াল আতাহার মিয়ারে। আতাহার মিয়ার গতরে তহন শাওন-মাইস্যা বিলের লাহান বিস্তর-ঢেউ! জলের আধিক্য খলবলিয়ে ছুটে গেছে বিস্তীর্ণ-সীমানার দিকে। হাওয়ার আকুলিবিকুলির সাথে পাল্লা দিয়ে ওই সীমানা দিগন্তরেখাকে যেন বিদীর্ণ করে দিতে চাইছে! আতাহারের এমন বাড়বাড়ন্ত গতর থেকে আলেকজানবিবি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত–মায়ের নজর বেজায় বদনজর! একবার লেগে গেলে সন্তানের কিছু না কিছু অনিষ্ট ঘটিয়েই ছাড়ে। ফলত তাগড়া-জোয়ান হয়ে উঠতে থাকা আতাহার মিয়ার দিকে সে তাকাতোই না

চোখের কোনা দিয়ে ছাওয়ালডারে সে দেখত কি দেখত-না! কিন্তু নিজের বাড়বাড়ন্ত চারাগাছটির দিকে আপনাআপনিই নজর চলে যেত আলেকজানবিবির। এজন্য সে নিজের ওপরই বেজায় বিরক্ত হতো। মার্বেলের মতো ছোটমোটো গর্তে ঢুকে যাওয়া দুইগালে ডান হাতের তিন আঙুল দিত আর মৃদু চাপড় মারতে মারতে আপন মনেই বলত–

তওবা, তওবা, আলেকজানবিবি–নিজের ছাওয়ালডারে চক্ষের মইদ্যে হান্দায়া রাখন ছাড়া তুমার কী আর কুনু কাইজকাইম নাই?

আদতে কথা কিন্তু মিথ্যা না। আলেকজানবিবির বুকের ভিতর দিনরাইত ধুঁকপুকানি–কিমুন ফনাফনাইয়া ডাঙর হইয়া উঠতাছে আতাহার মিয়া, আর তো হেয় আঞ্চলের তলায় থাইকব না। আর তো হেরে ধইরাবাইন্ধা আগলাইয়া রাহন যাইব না।

হেয় অহন বাইস্যা মাসে ছাইড়া দেওয়া হাঁসাগুলার লাহান খালেবিলে যাইব। গুগলিশামুকের তালাশে তালাশে ধানখেতের কোনাকাঞ্চি ঠুকরাইয়া খাইব। নইলে মাছের ফালফুল দেইখেলেই পুষ্করিণীর জল ঘোলা কইরে ফেলাইব। আইচ্ছা, হেইডা খাওক, খাওক নইলে ফেলাক হেইসবে আমার দরকার কী? আমি তো হেরে আর গলায় দড়ি পিন্দাইয়া রাইখবার পারুম না–মনকে এইভাবেই দমিয়ে রাখতে চায় আলেকজানবিবি। মনকে না-হয় থাপথুপ করে রাখতে পারে, কিন্তু মনের ভিতর উজিয়ে ওঠা আকথা-কুকথাকে তো দমিয়ে রাখতে পারে না সে।

আলেকজানবিবির মনের ভিতর নিত্যই উজিয়ে ওঠে–

এক কৌটা তেল/ কাইত অইলেই গেল!

অর্থাৎ তেল আছেই মাত্র এক কৌটা, সেটুকুও কাত হয়ে পড়ে গেলে তো সব্বোনাশ! বংশের প্রদীপ জ্বালানো যাবে না আর কিছুতেই। তখন ঘুটঘুটে আন্ধার ছাড়া এই জীবনের বুকেপিঠে আর কিছুই থাকার উপায় নাই।

একমাত্র ছাওয়াল আতাহার মিয়াকে নিয়ে এরকম ভাবনা তাকে দিবানিশি তটস্থ করে রাখে। আলেকজানবিবি নিজের মার্বেলের মতো বসে যাওয়া গাল দুটিতে ফের মৃদু চাপড় মেরে এই কুচিন্তাকে উড়িয়ে দিতে চায়। ধুর-অ ধুর-অ এইসব ছাতামাথা কীসব ভাবে সে? কেনই-বা এমন ভাবে?

দিবারাত্র শতেকবার তওবা কেটেও মনের ভেতর উজিয়ে ওঠা নাকি গজিয়ে থাকা কুচিন্তাকে তাড়াতে পারে না আলেকজানবিবি। তখন কিরকম এক বেদিশাভাব তাকে আক্রান্ত করে। কী করবে, কই যাবে, কাকেই-বা বলবে সে এইসব বেত্তান্ত? এইসব কুচিন্তার কথা তো কাউকেই বলা যায় না। বলতে গেলেই একেবারে ঝাঁটা হাতে তেড়েমেরে আসবে লোকজন। আর তার দিকে ঘেন্নার চোখে তাকিয়ে, মুখ কুঞ্চিত করে বলবে–

খাইয়া-দাইয়া আর কুনু কাইমকাজ নাই তুমার? ও গো ও আলেকজানবিবি, নিজের ছাওয়ালের দিকে চোখ দিওন ছাড়া আর কুনু কামই কি তুমার জইন্য বরাদ্দ নাই গো?

আবাগীর বেডি আবাগী, সোয়ামিডারে খাইছে, অহন বুঝি ছাওয়ালডারেও খাইব।

ছিঃক্ক ছিঃক্ক। এমুন দুরমুইশ্যা বেডিরে পিছা দিয়া পিডিলেও তো কম কিছুই অয়।

ফলত নিজের মনের ভিতর ভেসে ওঠা আজগুবি দুশ্চিন্তা নাকি কুচিন্তার কিছুই আলেকজানবিবি কাউকে খুলে বলতে পারে না। ফের একা একা এইসব ভয়ানক কুচিন্তা হজম করাও তার জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। সে ফের তওবা কাটে। ফের মার্বেলের মতো গর্ত হয়ে যাওয়া দুই গালে ডান হাতের আঙুলগুলি তুলে ঘন ঘন চাপড় মারে। তওবা, তওবা...

আর মনে মনে ভাবে, আমি কুন আবাগীর বেডি আবাগী? আমি কুন বেত্তমিজ মাইয়ানুক–নিজের ছাওয়ালের দিকে চাইয়া থাকন ছাড়া আর কুনু কাইম নাই এমুন মরারশুকি?

ধুর, অহন থিক্যা বেবাকতাই বাদ। মইরা গেলেও কিছুতেই আর চাইমু না ছাওয়ালের পানে।

মনে মনে শক্ত কসম কেটে সংসারের কাজেকামে ঢুকে পড়তে চায় আলেকজানবিবি। সংসারে তো আর কাজের অভাব নাই। যত কাজ–সবই তো সে একলা হাতেই সামলায়।

ঘরে রাখা খোরাকির চাউল নামতে নামতে মটকার তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এই হপ্তার মাঝে কিছু ধান ঢেঁকিঘরে না নিলেই নয়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর ধান থেকে চাউল বানানো যাবে না। চাউল বানানোর আগে ধানের আছে বিস্তর ক্যারিকেচার। ধান সেদ্ধ কর, সেই সেদ্ধ-ধান রোদ্দুরের তলায় ফেলে রেখে শুকাও, চিটাধান ওড়াও–তারপরেই না ঢেঁকির তলার কারবার।

আলেকজানবিবি এতসব ভাবনা নিয়েই দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। কিছু ধান আজ উড়াতেই হবে। ইস রে, কত কাজই না বাকি পড়ে আছে! আলেকজান ত্রস্ত হাতে কুলা টেনে নিয়ে শুকনা-ধানের কোল ঘেষে বসে পড়ে। গত দুইদিন ধরেই কিছু ধান সে রোদের বুকে ফেলে রাখছিল। ধান রোদ্দুরে দেয়ার আগে সমস্ত উঠান গোবর-লেপা করে দিয়েছে আলেকজান। এতে করে সূর্যের আলো খাঁড়া হয়ে ঢুকে পড়েছে মাটির গহিনে। গোবর-মাটির মিশ্রণে তাপ লেগে উঠানটা একেবারে চটচটা হয়ে উঠেছে। টান ধরা মাটিতে শুকাতে দেয়া সেদ্ধ-ধানের জল দ্রুত টেনে গিয়ে গিয়ে হয়ে উঠেছে একেবারে ঝনঝনা। এই শুকনা-ধান হাতের তালুতে নিলে সত্যি সত্যিই ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। ঝনঝনা ধান থেকে চিটাধান এখন সহজেই উড়িয়ে দেয়া যাবে। অবশ্য ধান উড়ানোর আগে বাতাসের ভাও বুঝে নিতে চায় আলেকজান। বাতাস যেদিকে বইছে তার উলটা দিকে কুলা ধরে দাঁড়ালে চিটাধান আপসেই উড়ে চলে যাবে বাতাসের আগে আগে। উড়তে উড়তে কোন মুলুকে যে চলে যাবে কে জানে?

ধানের কুলা মাথার ওপর তুলে নেয়ার আগে শাড়িটা গোছগাছ করে পরে নেয় আলেকজান। কারণ পরনের কাপড় আঁটসাঁট করে না-নিলে কাজে জুত পাওয়া যায় না। কাপড় বলতে তো রোদ-জলে নেতিয়ে যাওয়া বহু পুরাতন একটা শাড়ি তাও কিনা পেটিকোট ছাড়াই পরতে হয় তাকে। নিচে পেটিকোট নেই বলে আলেকজানবিবি খানিক কায়দা করে দুই-পল্লা প্যাঁচ দিয়ে সামনের দিকে ঘুরিয়ে আনে শাড়িটা। তারপর অভ্যস্ত হাতে আঁচল তুলে দেয় বাম কাঁধের ওপর। পিঠের ওপর থেকে আঁচল গুছিয়ে সরু করে নামিয়ে এনে শাড়িটা পেঁচিয়ে দেয় প্রায়–হাড্ডিসার কোমরে। আর আঁচলের খুঁটটা গুঁজে দেয় কোমরে বাধা কালো তাগার ভিতরে। তাগাতে আঁচলের খুঁট গুঁজে দেয়ার আগে কী যেন হাতাপাতা করে খুঁজে সে–আলেকজানবিবির কোমরের তাগার সাথে লটকে দেয়া আছে একটা কড়ি আর ছোট্ট একটা লোহার টুকরা। আতাহার গর্ভে আসতে না আসতেই মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এই কড়ি আর লোহার টুকরাটা এনে দিয়েছিল সোয়ামি মোতাহার মিয়া। ঘামে-স্পর্শে মলিন হয়ে যাওয়া শাদা-কাগজের ভাঁজ ধীরে ধীরে খুলে একটা ফুটো করা কড়ি আর লোহার টুকরা আলেকজানের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল–

কুমরের তাগার লগে লটকাইয়া থুইও এই দুইডা। প্যাটের ছাওয়ালের তাইলে ছুত্মুত লাগব না। আর তুমিও বদনজরের খপ্পর থিইকে দূরে থাকতে পারবা।

সেইদিন থেকে আলেকজানবিবির কোমরের সাথে লেপ্টে আছে এই দুই-জিনিস। গত ষোলো বছরে তাগা বদলাতে হয়েছে বহুবার, কিন্তু এই দুই জিনিস বড় যত্ন করে সংগে রেখেছে আলেকজান।

প্রতিদিনই হাড্ডি-চামড়া লেগে থাকা কোমর হাতড়িয়ে ওই দুইটার অস্তিত্ব পরখ করে নেয় সে। নিশ্চিন্ত হয়ে শাড়ি দুই-পাল্লা প্যাচ দিয়ে ঘুরিয়ে আনে। আজও শাড়ির খুঁট গুঁজে দেয়ার সময় পরখ করে নিলো, ওই দুই জিনিসের অস্তিত্ব তাগার সুতাতে ঝুলে আছে কি নাই?

মোতাহার মিয়া গত হয়েছে তাও তো বছর পাঁচেক হয়ে গেলো। যেইবার পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিল–সেইবছর, বা দুই-এক বছর এদিকওদিক করে–চন্দ্রবোড়ার হিংস্র-ফণার নিচে পড়েছিল বেচারা মোতাহার মিয়া। অমাবশ্যার রাইতে ধান-খেতের আইল ধরে একা একাই হনহনিয়ে আসছিল সে। আর আইল বরাবর শুয়ে থাকা বড়সড় এক চন্দ্রবোড়ার পেটের উপর পড়েছিল তার পা। একেবারে তক্ষুনি বিষে কালো হয়ে গিয়েছিল মোতাহার মিয়ার সারাদেহ।

আতাহার আর আলেকজানবিবি বিস্ফোরিত চক্ষে দেখেছিল–তরতাজা একটা মানুষ কেমন করে বিষে বিষে নিস্তেজ হয়ে যায়!

কোমরে বাঁধা কালো-তাগার কড়ি আর লোহার টুকরোটাতে হাত রেখে প্রায়ই বিচলিত বোধ করে আলেকজানবিবি–

বদনজরের খপ্পর থিইকে আমারে রক্ষা কইরে সে-ই কিনা কোন

আলাইবালাইয়ে বিষ-জর্জর হইয়ে জেবনডারে হারাইলো!

আহারে নসীব! মাইনষের নসীব বুঝি এরেই কয়?

২.

ধান-উড়ানির কুলা মাথার ওপর তুলে ধরতেই আলেকজানবিবি টের পায়–হাওয়ার ভাও আইজ বড় বেগতিক–এই বেগতিক হাওয়ার লাগ পাওয়া আইজ বড়ই মুশকিল। কইথন কই যে ভাইসি যাইতিছে এই হাওয়া? কই থন যে ভাইসি আইতিছে এই হাওয়া? নাকি আলেকজানবিবিই ভাইসি যাইতিছে এই বেসামাল-হাওয়ার টানে? আলেকজানবিবি না-ভাইসিলেও মাতার উপ্রের কুলাডা য্যান ভাইসি যাইতিছে! কুলাডা য্যান পঙ্খী অইয়া গেছে গো ! বড়সড়-পাখনাওয়ালা-পংখী! যে পংখী উড়তে উড়তে দক্ষিণে যায়। দক্ষিণ থাইকে যায় পুবে আর পুব থাইকে পশ্চিমে। পশ্চিম থাইকে যায় উত্তুরে। উত্তুরে গিয়া সে কিনা জোরে পাখনা নাড়ায়। ফলে উত্তরের হাওয়া বেগে বইতে থাকে। সেই দুদ্দাড়-হাওয়ায় ধানের চিটাগুলান তো উড়বই উড়ব, লগে পুরুষ্ঠুধানও কিছু উইড়ে যাইতে পারে। এমুনও অইতে পারে, আলেকজানবিবিও উইড়ে যাইতে পারে এমুন বেদিশা-হাওয়ার-টানে! তা আলেকজানবিবি উইড়ে আর যাইবে কই? কতদূরে যাইতে পারব হেয় আর?

উইড়ে উইড়ে মোতাহার আলির কাছেপিঠে গিয়া ঠেকতে পারলেও তো শান্তি কিছু পাওয়া যাইতে পারে!

আলেকজানবিবির দেহ থেইকে যৌবন তো এখনো এইকেবারে হারায়ে যায় নাই। তাই তার চক্ষের জ্যোতিও এখনো কিছু বেশ-কম হয় নাই। উত্তুরের-হাওয়ার খপ্পড়ে পড়ে কয়েকটা উড়োজাহাজ আথালিপাতালি-চক্কর দিইতেছে তা সে স্পষ্টই দেখতে পায়। দেখবে–মনের ভুলেও এমনটা আশা করে নাই। তার এখন থাকার কথা আউশ-ধানের জমিতে। মাত্র দিন-কয়েক আগেও যে জমিন চৈত্রের দাবদাহে ফুটিফাটা হয়ে দেহের কালো-কংকাল বের করে মরণ-দশায় পৌঁছেছিল। আতাহারই তাকে বহু যত্নে বাঁচিয়ে তুলেছে! রাতদিন জল-সিঞ্চন করেছে। বাঁশ আর দড়ি বেঁধে দোলনা-সেচনি দিয়ে পাশের ডোবার-জল তুলে মৃতপ্রায়-ভূমিকে কোমল করে তুলেছে। প্রচণ্ড রুক্ষমাটি ক্রমে কোমল হয়ে উঠলে তাতে তৈরি করেছে বীজতলা। আর ছিটিয়ে দিয়েছে আউশধানের বীজ। আরও দিন কয়েক বাদে এই বীজ ফেলতে পারতো আতাহার। কিন্তু এইবার যেন তার আর কিছুতেই তর সইলো না। দিন-ক্ষণের তোয়াক্কা না-করে কঠিন মাটিকে বহু পরিশ্রমে মোলায়েম করে তুললো সে। আতাহার জানে–এ জগতের সকলে নিরাশ করলেও মাটি কোনোদিন কাউকে নিরাশ করবে না। আতাহার জানে, মাটির বুকে আশ্রয় পেতে রাখা আছে সকলের জন্যই। ফলত প্যাচপ্যাচে-জল আর কাদার মাঝে আউশের-বীজ সবুজ-হাসির উদ্ভাস ছড়াল আর আতাহারের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু লাঙল দেয়া জমিতে জালার সারির নিশানা ঠিক না করে আতাহার এই মুহূর্তে আলেকজানের সন্মুখে কেন?

উড়ন্ত উড়োজাহাজের সারি, মিশকালো-মেঘ নাকি ধোঁয়া এবং উত্তুরে-হাওয়ার প্যাচগোছের মাঝে এক্ষণে আতাহারও যুক্ত হয়েছে! আলেকজানবিবির মাথার ভিতর চিটাধানের ওড়াউড়ি শুরু হলে সে-ও খানিকটা তন্দা মেরে যায়। থতোমতো খেয়ে চক্ষের সামনে থেকে কোনটা আগে সরাবে সহসা বুঝে উঠতে পারে না! কিন্তু আতাহার–জলজ্যান্ত যুবকটি সমস্ত কিছু আড়ালে ঠেলে দিয়ে কিনা একেবারে আদুল-গায়ে মায়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল!

আতাহারের হাতে তখনো ভেজা-কাদা লেপ্টে আছে। উঁচু করে পরা

রাদের বুকে ফেলে রাখা সেদ্ধ-ধানের স্তূপে শালিক আর চড়াইয়ের দল হুটোপুটি খেতে খেতে হল্লা শুরু করেছে, মাথার ওপর কয়েকটা কাক উড়ে উড়ে কা কা ডেকে গেলেও আলেকজানবিবির তন্দা কাটতে চায় না। সে কিনা তাকিয়ে তাকিয়ে আতাহারকে দেখে! আদুল-গায়ের আতাহারের বুকজুড়ে আউশ-ধানের জালার মতো ঘন হয়ে লোম গজিয়েছে

চিলের মতো ঘুরে ঘুরে সারা আসমানজুড়েই চক্কর দিচ্ছে তারা। আলেকজানবিবির বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে! ধানের চিটা ওড়ানো একেবারে মাথায় ওঠে। কুলাটা একপাশে নামিয়ে রেখে সে উড়োজাহাজের চক্কর-খাওয়া খেয়াল করার চেষ্টা করে।

এতক্ষণ বাদে সে বুঝতে পারে–হাওয়ার-ভাও আইজ ক্যান সে ধরতে পারে নাই?

দুদ্দাড়-বেতাল-হাওয়ার লগে তো অই উড়োজাহাজগুলার পাঙ্খার হাওয়াও আইসে মিশ খাইয়েছিল!

আলেকজানবিবি বিষম-ভাবনায় পড়ে যায়। ভাবনায় পড়ে ধামা-ভরা-ধান ঢেঁকির তলায় নেয়ার কথাও বেমালুম ভুলে যায় সে!!

গ্রাম কুমকুমারির আসমানে তো এতদিন কাক, চিল, বাজ আর ঈগলের ওড়াউড়িই ছিল, এক্ষণে কিনা উড়োজাহাজও চক্কর খেতে শুরু করেছে!

উত্তুরের-হাওয়া বেগে দক্ষিণের দিকে ধেয়ে যায়। আলেকজানবিবি সেদিকে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট দেখতে পায় দক্ষিণের দিক থেকে কালো-কালো-ধূম্রকুণ্ডলি আসমানের সব রঙ গিলে ফেলছে! ধোঁয়া নাকি মেঘ? মেঘ নাকি ধোঁয়া? এমতো বিভ্রমে থেকেও আলেকজানবিবি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারে–খানিক আগেই তো আসমান তেজদীপ্ত-রোদ্দুরে নেয়ে উঠেছিল! উজ্জ্বল-আলো চারদিকে আধুলির-রঙ ছড়িয়ে এই পৃথিবীকে রূপার মতো ঝকঝকে করে তুলেছিল। এক্ষণে কী হলো? এই কালো-কালো-মেঘ নাকি ধোঁয়া, ধোঁয়া নাকি মেঘের বিভ্রমে সে কিনা এমনতর কাতর হয়ে পড়লো?

উত্তুরে-দাপুটে-হাওয়া নাকি ওইসব কালো-মেঘের-কুণ্ডলি নাকি ধূম্রজাল ফুঁড়ে দিয়ে যে তার সামনে অবিকল ছায়ার মতো এসে দাঁড়াল, আলেকজানবিবি তাকে এই মুহূর্তে, এই গোবর-লেপ-দেয়া উঠানে লুঙ্গির তলায় লোমশ দুইখানা কালোকোলো-পা জলকাদার মাখামাখি–একটা পায়ে কালো জোঁক রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আর নড়তেই পারছে না–সেদিকে আতাহারের কিনা বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই! আউশের দুই-একটা জালার কোমল-সবুজ-ডগা ঘনচুলের ভিতরে লুকোবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে–আলেকজানবিবি ছেলের এমন বিধ্বস্ত-অবস্থা দেখে কী বলবে কিছুই যখন ভেবে পায় না–

তখুনি কিনা আতাহারই কথা বলে ওঠে–

মা যুদ্ধ বাধ্ছিছে, যুদ্ধ! দ্যাশ স্বাধীনের লাইগে যুদ্ধ!

আলেকজানবিবি ছেলের কথায় এইবার আরও খানিকটা তন্দা খায়। সবকিছুই তার মাথার ভিতর আরও খানিকটা তালগোল পাকায়–তার আট-ক্লাস পাশ-দেয়া ছেলে–রাত হলেই যে দোস্ত রজবালির বাড়িতে গিয়ে রেডিও শুনে আসে–তার কথা বোঝার সাধ্যি তো আলেকজানবিবির নাই!

কীসের যুদ্ধ আর কেনই-বা যুদ্ধ সেকথা হয়তো আতাহার মিয়াই জানে। আতাহার মিয়া তো কতকিছুই জানে! আলেকজানবিবির সেসবের বিন্দুবিসর্গও জানার কথা নয়।

রোদের বুকে ফেলে রাখা সেদ্ধ-ধানের স্তূপে শালিক আর চড়াইয়ের দল হুটোপুটি খেতে খেতে হল্লা শুরু করেছে, মাথার ওপর কয়েকটা কাক উড়ে উড়ে কা কা ডেকে গেলেও আলেকজানবিবির তন্দা কাটতে চায় না। সে কিনা তাকিয়ে তাকিয়ে আতাহারকে দেখে! আদুল-গায়ের আতাহারের বুকজুড়ে আউশ-ধানের জালার মতো ঘন হয়ে লোম গজিয়েছে। কালো জোঁকটা রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে হাঁটুর নিচে লটকে আছে তো আছেই–অথচ আতাহারের চোখমুখে কিনা শ্রমের-স্বেদ, যুদ্ধের উদ্বেগ-আতংক ছাড়া আর কিছুই নাই?

আলেকজানবিবির ডান হাতটা নিজের অজান্তেই কোমরের সেই

কালো-তাগা খুঁজে বেড়ায়। কড়ি আর লোহার মাঝে হাতটা স্থির হলে বুকে যেন বল ফিরে পায় সে–

তাগার এই কড়ি আর লোহা আমার ছাওয়ালডারে বদনজর থাইকে বাঁইচে দিবে। তার জন্মের সমুয় থেইকেই তো এই জিনিস আমি লগে লইয়ে ঘুরতে আছি!

তার বাপই তো আমারে পেন্দিয়ে দেছিল।

আতাহার মিয়া মাকে ঘরে যাওয়ার কথা বললে তাগায় বাঁধা কড়ি আর লোহার বেড়াজাল থেকে আলেকজানবিবিও বের হয়ে আসে।

তার মানে ব্যাপার গুরুতর!

আতাহার মিয়া ঘরের চকির ওপর আলেকজানবিবিকে বসিয়ে দিয়ে বলে–

মা, যুদ্ধ বান্ধিছে। দ্যাশ স্বাধীন করার লাইগে যুদ্ধ! আমি এই যুদ্ধ করবের চাই।

আলেকজানবিবি ফ্যালফ্যাল করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কীসের যুদ্ধ, কখন বান্ধিল এই যুদ্ধ?

আতহার মুখ নিচু করে ঘরের মেঝেতে তাকিয়ে রয়েছে। আলেকজান দেখে ছেলের নাকের নিচে গোঁফের রেখা কীরকম ঘন হয়ে উঠেছে। ধানের জালার দুইটা কচি-সবুজ-ডগা আতাহারের কপালের ওপর ঝুলে আছে। এতে আতাহারের চেহারা যেন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে!

আলেকজানবিবির মায়ের মন–সে তো আগেভাগেই সবকিছু বুঝে যায়!

ফলত আতাহারকে যে কিছুতেই আটকানো যাবে না সেটা সে টের পেয়ে যায়।

গলার স্বর যতোটা সম্ভব কোমল করে ছেলেকে বলে–

পায়ের জোঁকটা ফেলাইয়া দেও। রক্ত খাইয়া তো পেট ফুলাইয়ে রইছে।

আতাহার চমকে উঠে নিজের কাদা-জলে একাকার হয়ে থাকা পায়ের দিকে তাকায়।

এক ঝটকায় চকি ছেড়ে উঠে গিয়ে উঠানে নামতে নামতে বিড়বিড় করে বলে–

হ, মা জোঁক তো ফেলাইতেই হইব। খামাখাই এত রক্ত খাইলে হেইগুলারে মারণ ছাড়া আর গতিক কী?

আলেকজানবিবি ছেলের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

সেও ধীর পায়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়। ঝাঁক-ঝাঁক-শালিক আর চড়াই পুচ্ছ নাচিয়ে নাচিয়ে আলেকজানবিবির শুকাতে দেয়া ধান সাবাড় করে চলেছে! কিন্তু এখন আর আলেকজানবিবির তাদের তাড়ানোর সময় নাই।

খেতের সমস্ত কাজ ফেলে চৈত্রমাসের উত্তাপ মাথায় ঢেলে ছেলেটা ঘরে ফিরে এসেছে। এক্ষুণি তাকে ভাতের-হাড়ি চুলার ওপর না-চড়ালেই নয়। এক মুঠো চাউল আর দুইটা আলু অন্তত তড়িঘড়ি সেদ্ধ করে ছেলেটার পাতে তুলে দিতে হবে।

৩.

শাওন মাসের ঘোর-বাদলায় আউশের-খেত যখন জলে টলোমলো করছে, পাকাধানের পুরুষ্ঠ-ছড়া বার বার ঝুঁকে পড়ছে সেই জল অভিমুখে–যেন সে এক্ষুণি তলিয়ে যেতে চায়! যেন সে আর জীবনের এতসব ভার আর বইতে পারছে না! যেন সে চায়, এ জীবনের সমস্ত কিছুই আজ অকাতরে বিসর্জন দিতে।

ঘোলা-জলের দিঘল-চাদরের তলায় বুক অব্দি ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আতাহার মিয়ার আউশ-ধানের খেত। হাওয়া বেগে বইলে নড়ে উঠছে জল। ছোট-ছোট-ঢেউ এসে নাড়িয়ে দিচ্ছে গুচ্ছ-গুচ্ছ ধানের–ছড়ার অবনত হয়ে থাকা। আলেকজানবিবি ধানকাটার মুনিষ ঠিক করে রেখেছে–দুই-একদিনের ভিতরেই এই সোনালি-শস্য উঠে যাবে আলেকজানবিবির গোলায়। ধান শুকিয়ে সেদ্ধ হবে, সেদ্ধ ধান ফের পাবে রোদের উত্তাপ। যাবে ঢেঁকিঘরের ঢেক্কুর ঢেক্কুর শব্দের তলায়। লালচালের ভাত রাঁধতে রাঁধতে আলেকজানবিবি ভাববে–

হাঁড়িতে আইজ কিছুডা চাউল বাড়তি দিইয়ে দিমু। আতাহার মিয়া আউশের পান্তা খেইতে বড় ভালোবাসে।

সত্যি সত্যিই আউশের ধান কাটা সারা হয়। সেসব ধান উঠে যায় আলেকজানবিবির গোলাঘরে। লাল লাল পুরুষ্ঠ-চাল–কিন্তু এক-মুঠো-চাল বাড়িয়ে রাঁধার উপায় নাই আলেকজানবিবির। কার জন্য রাঁধবে সে? চাল রেঁধে খেতে গেলেও তার গলা দিয়ে সে ভাত আর নামতে চায় না। আতাহার মিয়া নিজ হাতে খেতের এই ধানের গাছ রোপন করে গেছে। নিজের ছাওয়ালের পরিশ্রমের ফসল–

কীভাবেই-বা এই ভাত গোগ্রাসে খেতে পারে আলেকজান?

তার ঘরবাড়ি আজ শূন্য! খাঁ খাঁ করছে উঠান। অস্থিরমতি-চড়াই আর শালিকের দল লুকিয়ে পড়েছে কোন গাছ নাকি পাতার আড়ালে। কিংবা যুদ্ধের-গন্ধ পেয়ে উড়ে গেছে নিরাপদ-আশ্রয়ে। শুধু দুরমুইশ্যা-কাকের-দল তারস্বরে কা-কা-কা করে অবিশ্রাম ডেকে যাচ্ছে মাথার ওপরে!

আলেকজানবিবির মনে কু ডাকতে থাকে–

ইস! মরারশুকা কাউয়ার কাউয়া–তগো কী আর যাওনের জায়গাজুয়গা নাই?

আলেকজানবিবি দুই ঠোঁট সরু করে হুশ হুশ শব্দ করে কাক তাড়াতে চায়–কিন্তু বজ্জাত কাকের-দল একচুলও নড়ে বসে না!

আপদ আর কী!

আতাহার মিয়া কোনো সংবাদ পাঠায় নাই বহুদিন হলো। তা পাক্কা মাস তিনেক তো হবেই। আলেকজানবিবি ভুলোমন হলেও ছেলের সংবাদের দিন-তারিখ একেবারে মুখস্থ করে রাখে। ছেলেটা তার ভারি সুবোধ। পাক-ভারত যুদ্ধের আগে না পিছে–যখন বাপটা মারা গেল–তখন থেকেই আলেকজানকে ফেলে কোথাও আর যায় নাই আতাহার। মাকে ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে। কিন্তু এখন কিনা যুদ্ধ করতে গেলো। নিজের দেশকে স্বাধীন করার যুদ্ধ। আলেকজানবিবি প্রথমে মানতে চায় নাই। কান্নাকাটি করে নাক- চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে! ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছে–

বাজান, তুমি চইলে গেইলে আমি তুমারে পাইমু কই? কই পাইমু কও?

আমার তো আর কেউ-ই নাই।

আতাহার চোয়াল শক্ত করে বলেছে–

আমি কি এলকাই যাইমু মা? দেখ গিয়া কতশত মায়ের পুত যাইতেছে। আমাগো রজবালিও তো যাইতেছে।

মা, মা গো–একবার ভেইবে দেইখো, এই দ্যাশডা ওরা নিয়া নিলে আমাগোর অবস্থা কী হইতে পারে?

বলেই চুপ হয়ে গিয়েছে আতাহার। অতঃপর গভীর কোনো চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছে।

দিন কয়েক চুপ করেই রইলো সে। আলেকজান ভাবলো–যুদ্ধে যাওনের বাই মাথা থেইকে নেইমে গেইছে বুঝি?

কিন্তু মিলিটারিরা কুমকুমারির বাজারের দোকানপাট যেদিন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলো, আতাহার একেবারে ক্ষেপে উঠলো। এক দৌড়ে চলে

আতাহার মিয়া কোনো সংবাদ পাঠায় নাই বহুদিন হলো। তা পাক্কা মাস তিনেক তো হবেই। আলেকজানবিবি ভুলোমন হলেও ছেলের সংবাদের দিন-তারিখ একেবারে মুখস্থ করে রাখে। ছেলেটা তার ভারি সুবোধ। পাক-ভারত যুদ্ধের আগে না পিছে–যখন বাপটা মারা গেল–তখন থেকেই আলেকজানকে ফেলে কোথাও আর যায় নাই আতাহার। মাকে ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে

সুকানিকে হত্যার পরদিনই আতাহার মিয়াও নিখোঁজ হলো। গ্রামের বেবাকে জানলো যে, আতকা আতাহার মিয়ার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আলেকজানবিবি জানে সত্য ঘটনাটা–ছাওয়াল আমার যুদ্ধ কইরবের গেইছে! দ্যাশ স্বাধীন কইরবের গেইছে

গেল রজবালির ঘরে। আলেকজান এতদিনে জানে যে, যুদ্ধের সব খবরা-খবর রেডিও খুললেই পাওয়া যায়। রজবালির বাপ ঘরে একটা ফিলিপ্স তিন ব্যান্ডের রেডিও কিনে রেখেছে। আতাহার শুধু নয়, কুমকুমারির জোয়ান-বুড়া বেবাকেই যুদ্ধের খবর শোনার জন্য কান খাঁড়া করেই রাখে! রেডিওর আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে ।

বাজারে আগুন দেয়ার পরদিনই গ্রামের সুকানিকে মেরে ফেললো পাকিস্তানি-মিলিটারিরা। সুকানিকে সকলে বলতো পাগল। শরীরে ছালা জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো সে! হয়তো সে পাগল কিংবা পাগল নয়!

সুকানির দোষ কী সেটাও শুনলো আলেকজানবিবি।

গায়ে ছালা-জড়ানো সুকানিকে হানাদাররা ছদ্মবেশী মুক্তিফৌজ ভেবেছিল। ভেবেছিল পাগল সেজে ভড়ং করতে এসেছে!

এদিকে সুকানিও তো কম নয়! সে নাকি সব কথার জবাবে শুধুমাত্র একটা কথাই বলেছে–

জয়বাংলা, জয়বাংলা, জয়বাংলা!

সুকানির ল্যাগব্যাগে-কংকালসার দেহটা নিষ্প্রাণ করার জন্য মেশিনগান কেন দরকার হয়েছিল আতাহার তা জানে না। আলেকজানবিবিও জানে না। কুমকুমারি গ্রামের কেউ-ই তা জানে না।

সুকানিকে হত্যার পরদিনই আতাহার মিয়াও নিখোঁজ হলো। গ্রামের বেবাকে জানলো যে, আতকা আতাহার মিয়ার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আলেকজানবিবি জানে সত্য ঘটনাটা–ছাওয়াল আমার যুদ্ধ কইরবের গেইছে! দ্যাশ স্বাধীন কইরবের গেইছে।

কিছু শুকনা-চিড়া, গুঁড়, দুইটা লুঙ্গি, একটা গামছা আর দুইটা শার্ট ঝোলায় ফেলে আতাহার প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলো। আলেকজানবিবিকে একফোঁটা কাঁদার সুযোগও দিলো না সে!

আলেকজানবিবির একবার মনে হয়েছিল–কোমরের কালো-তাগাটা খুলে আতাহারের কোমরে বেঁধে দেয়–কিন্তু সে রকম কোনো সুযোগ আতাহার তাকে দিলোই না।

যতদিন কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে পৌছাতে পারে নাই, ততদিন মায়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আতাহারের। ভারতে পা দেয়া মাত্রই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আলেকজানবিবি এখন নিয়ম করে রজবালির ঘরে যায়। কিন্তু রজবালিও তো নিরুদ্দেশ। আলেকজানবিবি রেডিওতে কান লাগিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবরাখবর শোনে। রজবালি বা আতাহারের কোনো সংবাদই তারা কেউ-ই পায় না।

দিন গেল, মাস গেল–আলেকজানবিবির শিমের বড়-মাচানটা এন্তার বেগুনি-বেগুনি-ফুলে ছেয়ে গেল। কার্তিক মাসের ঠিক এই মাঝামাঝি সময়ে আসমানের–কপাট খুলে ঝির ঝির করে হিম নামতে শুরু করে। আর তক্ষুনি কিনা ছাওয়ালের সংবাদ পেলো আলেকজানবিবি। ভারতের বর্ডার পার হয়ে তারা যশোর অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। আর বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে হানাদারদের বক্ষ! আলেকজানবিবি পেলো আরেকটি সুসংবাদ–মুক্তিবাহিনীরা যশোর জেলা থেকে পাকিস্তানি মিলিটারিদের দ্রুত হটিয়ে দিচ্ছে।

এখন বোরোধানের মরশুম। কাদা-জলে বীজতলা তৈরি করে তাতে ধানের-বিছন ছড়িয়ে দিতে হবে। আলেকজানবিবি আতাহারের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে–এই বুঝি তার ছাওয়ালডা এইসে পড়লো। এইসেই তো আইল বেঁধে দিইয়ে জল আটকে ফেইলেবেনে। তারপরে সেই কাদা থকথকে-জলে বোরো-বিছন ছিটিয়ে দিবে। কিন্তু আলেকজানবিবির মনের আশা পূর্ণ হয় না। আতাহার ফিরে আসা দূরে থাক, আতাহারের কোনো সংবাদও তার কাছ আর আসে না।

ঘরে দোর দিয়ে আলেকজানবিবি হু-হু করে কাঁদে। রাতভর কেঁদেকেটে ভোরবেলায় চোখ মুছে ফের খেতের আইলের মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়–আতাহার ফিরে এলে এই পথ দিয়েই আসবে। যত দূর দৃষ্টি যায় আলেকজানবিবি তাকিয়েই থাকে। তাকিয়েই থাকে। যদি আতাহারকে দেখা যায়! আতাহারকে দেখা না গেলেও বহু দূর থেকে তার ছায়াটাও একবার যদি দেখতে পায় সে!

আশপাশের সমস্ত জমিগুলাতে বোরোর জালা রোপন করা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র আলেকজানবিবির জমিনে ঘাস-জংলা-বিচালি ফনফনিয়ে বেড়ে চলেছে। কবে ফিরবে আতাহার? পথপানে চেয়ে চেয়ে আর কাউকে বর্গা দিতেও ভরসা পায় না আলেকজানবিবি।

জল-কাদা-জোঁকে দুইপা ডুবিয়ে নিজের জমিতে গোছা-গোছা-জালা রোপন করবে তার জোয়ান-ছাওয়াল আতাহার। রোদ-মেঘের তলায় প্রচণ্ড-পরিশ্রম করতে করতে কুলকুল-ঘেমে নেয়ে উঠবে। আর ঘরে ফিরে আউশের চালের এক থালা বাসী-পান্তা সাবাড় করবে লবণ, শুকনা-মরিচ-ভাজা আর কাঁচা-পেঁয়াজ ডলে।

৪.

ধানী-জমিটা এইবার পতিত পড়ে রইল। বোরোধানের ছোটছোট কোমল-জালা বাড়বাড়ন্ত হয়ে ঢেকে দিলো না এই মাটির উদোম-শরীর! চারপাশের থইথই-সবুজের মাঝে বড় বেখাপ্পাভাবে নিস্তেজ শুয়ে রইল সে। যেন-বা আলেকজানবিবির মতোই নিঃসঙ্গ কোনো নারী! যার বুকের ভিতর তীব্র হাহাকার, ধু ধু শূন্যতা–নিজের গর্ভে ফসল বুনে দেবার জন্য গোপন আর্তনাদ, আর যন্ত্রণায় নুইয়ে পড়া–কিন্তু কাউকে সেকথা বলার উপায় তার নাই! বলার মতো ভাষা তার মুখে নাই! এই বোবা-মাটির ভাষা বুঝতে পেরে একবিন্দু সবুজ বুনে দেওয়ার মতো কেউ নাই! এমনকি রুক্ষু-মাটির ওষ্ঠে এক আঁজলা জল তুলে দেবার মতোও কেউ নাই!

আদতেই দশা বড় করুণ! বর্গা দেবার মতো এইবার কাউকেই পেলো না আলেকজানবিবি। বর্গাদার পাবে সে কীভাবে? কুমকুমারির প্রায় জোয়ান-মরদই তো যুদ্ধ করতে চলে গেছে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। নিজের জাতির আলাদা পরিচয়ের জন্য যুদ্ধ। নিজেদের গেরিলা বানিয়ে ভয়ংকর এক যুদ্ধ।

রুক্ষু-খেতের বুকে লাঙলের ফলা বসিয়ে দেবার মতো তাগড়া পুরুষ গ্রামে এখন নেই বললেই চলে।

বোরো-ধান খেতে সবুজ-রঙ গাঢ় হলো, ধানের খেতে দামাল-হাওয়া দুদ্দাড় হামলে পড়তে না পড়তেই যুদ্ধ থেমে গেলো। দেশ স্বাধীন হলো। নতুন এক রাষ্ট্র–বাংলাদেশ!

যুদ্ধের ক্লান্তি আর বিজয়-উল্লাস নিয়ে একে একে ঘরে ফিরতে শুরু করল তাগড়া-জোয়ানেরা। তারা যখন ফিরে এল কাউকে ঠিকঠাক যেন চেনাই যায় না। তামাটে গায়ের বরন রোদে জ্বলে, বৃষ্টিতে ভিজে কালোকেশরের পাতার মতো হয়ে উঠেছে! কারো কারো মুখাবয়বে দাড়িগোঁফের ঘনজঙ্গল। ওই জঙ্গল ভেদ করে আসল মানুষটিকে চিনতে পারা বড় কঠিন কম্ম! কিন্তু আলেকজানবিবি ফিরে আসা প্রায় প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল–আতাহার মিয়া? তার আতাহার মিয়া কই? ফেরে নাই সে? ও আতাহার মিয়া কই তুমি গো?

আতাহারের ফিরে আসতে এত বিলম্ব কেইনে? কেইনে ফেরে নাই? এই দেশে তো এখন আর কুনু যুদ্ধ নাই, আর গোলাগুলি নাই, বাতাসে

বারুদের গন্ধ নাই–তবে কেইনে ফেরে নাই আতাহার মিয়া?

মাকে একা ফেলে একদণ্ড দূরে থাকার মতো ছাওয়াল আতাহার মিয়া নয়! তাহলে তার ফিরে আসতে এত বিলম্ব কেন?

আতাহারের সঠিক খবর কেউ-ই দিতে পারল না আলেকজানবিবিকে।

কে একজন বলল যশোর জেলা স্বাধীন হওয়ার পরপরই ভৈরব-নদ পাড়ি দিয়ে আতাহার কোথায় যেন চলে গেছে। মাগুরা নাকি খুলনা? খুলনা থেকে নদীপথে ভারতের সীমান্তের দিকেও যেতে পারে সে!

এতসব আগুরিবিগুরি নাকি আজবগজব কথাবার্তার মাঝে কিছুই বুঝতে পারল না আলেকজানবিবি। শুধু আনমনা হয়ে শুনে যেতে লাগল। না শুনেই বা উপায় কী তার? আতাহারের সন্ধান তো তাকে করতেই হবে।

কিন্তু রজবালি ফিরে এসে বলল অন্যকথা–ঘোরতর যুদ্ধ চলার সময় নাকি সংবাদ এসেছিল–আতাহার যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছে! কিন্তু কোথায় মারা গেছে? কীভাবে মারা গেছে–রজবালি এসবের কিছুই আর জানতে পারে নাই। যদিও তারা একই সেক্টরে ছিল। ঘোরতর গোলাগুলির সময় কে কোথায় ছিটকে গিয়েছে তার হদিস পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু রজবালি এ-খবর নিশ্চিত জানে–আতাহারের বুকে গুলি লেগেছিল–তবুও সে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে–

মারা যাওয়ার সময়েও মায়ের কথা বারংবার বলেছে–আমার বিধবা-দুখিনি-মা! ফায়জুলের সম্মুখেই মারা যায় আতাহার। কিন্তু ওই ফায়জুলের সঙ্গে রজবালির দেখা হয় নাই। আতাহার মারা যাওয়ার পরপরই মাথায় গুলি লেগে ফায়জুলও মারা গেছে!

আলেকজানবিবি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রজবালির দিকে। এমন মারাত্মক-নিষ্ঠুর কথাটা কীভাবে বলতে পারল এই রজবালি? সে ইয়াজিদ নাকি সীমারের বংশধর? দাড়ি-গোফের জঙ্গলে ঢাকা রজবালিকে সত্যিই তার অচেনা মনে হতে লাগল!

আলেকজানবিবি এরপরও বহু চেষ্টা করে গেল, কিন্তু আতাহারের সংবাদ কেউই তাকে সঠিকভাবে দিতে পারলো না!

আলেকজানবিবির কোমরের হাড্ডি-মাংস এখন একেবারে চিমসে আছে, আর আছে সেই কালো তাগায় বাঁধা কড়ি আর লোহার টুকরা–বিপদ তবুও আতাহারকে গিলে ফেলল? তামশার কথা নাকি এইগুলান?

স্বাধীন দেশে লাল-সবুজ রঙের পতাকা পতপত করে উড়তে লাগল আর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা খুঁজে দেখা আলেকজানবিবির একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল। নিজে সে আনপড়-কিন্তু একে-তাকে ধরে ঠিকই সে জেনে নেয় নিহতদের নাম। তবে আলেকজানবিবির মনে এখনো ক্ষীণ আশা–ছাওয়ালডা ফিইরে আইসতেও পারে। রজবালি কী শুনতে কী না কী শুইনে ফেলাইছে, কী দেইখিতে কী না কী দেইখে ফ্লোইছে–এত কথা বিশ্বাস যাইতেও অয় নাকি?

৫.

আউশ-বোরো-আমন কত ধানের কত মরশুম যে পেরিয়ে গেল–কত আষাঢ় আর শাওন, চৈত্র আর বৈশাখ–কিন্তু আলেকজানবিবি আতাহারকে খোঁজাখুঁজি ক্ষান্ত দিলো না।

তার চক্ষের আলো প্রায় নিভু-নিভু–মোষের গলার চামড়া হয়ে ঝুলঝুলে হয়ে গেছে দেহের ত্বক! সেই ঝুলঝুলে ত্বকের ওপর চিতাবাঘের শরীরের মতন কালো কালো ফুটকি পড়েছে! আহা! একদা কত মসৃণ ছিল এই দেহ! ধান-উড়ানির হাত দুইটাতে কতোই না শক্তি ছিল–আর এখন? হাতে ধরা বাঁশের লাঠিটা এখন তার নিত্য সঙ্গী। লাঠিতে ভর দেয়া ছাড়া আলেকজানবিবি এখন আর হাঁটতেও পারে না। কিন্তু তার কান দুটি ভারি সজাগ! কান দুটি সদা উৎকর্ণ!

আলেকজানবিবি শুধু নয়, মুক্তিযোদ্ধা আতাহার মিয়ার নামটা শহিদের তালিকায় অনেকেই খুঁজে ফেরে। তাদের ইচ্ছা–মরার পূর্বে যদি এই বুড়িকে সামান্য শান্তিও দেয়া যায়!

বহু বছর বাদে আঁতকা একদিন খবর আসে–খবর জানায় আরেক মুক্তিযোদ্ধা ইউনুছ আলি–মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়সও ছিল ষোলো। আতাহার মিয়ার বন্ধু ছিল সে। ইউনুছ আলি জানায় 'রক্তাক্ত ৭১' নামে এক বইতে নাকি শহিদদের তালিকায় আতাহার মিয়ার নাম উঠেছে। বইয়ের লেখক তাদের আরেক সহযোদ্ধা বজলুর মজিদ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক অর্ধশতক পর ছেলে আতাহারের সন্ধান পেলো আলেকজানবিবি! মেহেরপুরের ভৈরব-নদের ধারে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে আলেকজানবিবির ছাওয়াল আতাহার।

বেদনার পথ বড় দীর্ঘ, বড় সর্পিল, শ্লথ–এই পথ যেন কিছুতেই ফুরাতে চায় না! তবুও আলেকজানবিবি লাঠিতে ভর করে কুঁজো হয়ে হেঁটে চলে। চক্ষের আলো নিভু নিভু। কিন্তু কানে আজও সব স্পষ্টই শুনতে পায়–আলেকজানবিবি শোনে জলের শব্দ! ঝুমুত ঝুমুত শব্দে অগণন ঢেউ হারিয়ে যাচ্ছে আরেক ঢেউয়ের তলায়। ফের তলা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে নতুন-ঢেউ! রজবালিকে বাম হাতে ধরে আছে আলেকজান। তার আরেক হাত লাঠির মাথায় চেপে ধরা।

সারি সারি কবরের মাঝ থেকে আতাহার মিয়াকে আলাদা করে আজ আর চেনা যাবে না। কারণ কারো সমাধিতেই নামফলক লাগানো হয় নাই।

পথভ্রমণের শ্রান্তিতে ঘাসের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে আলেকজানবিবি। প্রায়ান্ধ-দৃষ্টিতে কী যেন ইতিউতি খুঁজে ফেরে। আতাহারের কবর? নাকি আতাহারকেই? কই ঘুমিয়ে আছে তার সেই তাগড়া ছাওয়াল আতাহার?

ক্লান্ত-শ্রান্ত নব্বই বছরের বৃদ্ধা আলেকজানবিবি আলগোছে নিজের পা থেকে দুইফিতার মলিন স্যান্ডেল জোড়া খুলে ফেলে। অদূরেই খরস্রোতা ভৈরবের জলস্রোত–ঘূর্ণি তুলে ভাসিয়ে নিচ্ছে এই পৃথিবীর সমস্ত বেদনা নাকি সমস্ত জড়-জঞ্জালকে? কাঁপা কাঁপা হাতে আলেকজানবিবি পায়ের জীর্ণ-স্যান্ডেলজোড়া নিক্ষেপ করে সেই বেগবান জলরাশিতে। মুহূর্তে ভেসে যায় আলেকজানবিবির পায়ের স্যান্ডেল দুইখানি।

যে মাটিতে শহিদেরা ঘুমিয়ে আছে, সে মাটির ওপরে আলেকজানবিবি আর কোনোদিন স্যান্ডেল পায়ে হাঁটতে পারবে না।

রজবালির কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরতে শুরু করে আলেকজানবিবি। আহ! কোমল-ঘাসের ওপর খালি পায়ে হেঁটে যেতে যেতে কিরকম যে নির্ভার লাগছে।

আলেকজানবিবির কোমরে বাঁধা তাগাতে হালকা করে টান দিতেই সেটা পলকেই ছিঁড়ে আসে। পুরাতন হয়ে যাওয়া ফ্যাশফ্যাশে সুতা–বহুদিন হলো নতুন তাগা কিনে এনে কড়ি আর লোহাটা গেঁথে নেওয়া হয় নাই। আর কীসের বদনজর থেকে বাঁচার আশায় কোমর ঘিরে তাগার পাহারা রাখবে আলেকজানবিবি?

ভৈরবের জলস্রোতে আলেকজানবিবি আলগোছে ফেলে দেয় বহুবছর ধরে আগলে রাখা লোহার টুকরা আর সেই কড়িটিও।

নিজের দেহে এতসবকিছুর ভার বহন করে আলেকজানবিবি আর এক কদমও হাঁটতে চায় না...! •

পাপড়ি রহমান
কথাসাহিত্যিক

আপনার মতামত জানান
যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯
এক্সটেনশন : ১১৪২
inf2.dhaka@mea.gov.in
ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

একনজরে সিকিম

দেশ	ভারত
অঞ্চল	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল
রাজধানী	গ্যাংটক
জেলা	৬টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৭৫
সরকার	
• রাজ্যপাল	শ্রী লক্ষণ প্রসাদ আচার্য
• মুখ্যমন্ত্রী	প্রেম সিং তামাং
• বিধানসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট (৩২টি আসন)
• সংসদীয় আসন	রাজ্যসভা ১ ॥ লোকসভা ১
• হাইকোর্ট	সিকিম হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	৭,০৯৬ বর্গকিমি (২,৭৪০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	২৭তম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৬,১০,৫৭৭
• ক্রম	২৮তম
• ঘনত্ব	৮৬ কি.মি (২২০ বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৮২%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	৩১৬৬ কোড IN-SK
সরকারি ভাষা	ইংরেজি, নেপালি, সিকিমিজ, লেপচা
ওয়েবসাইট	www.sikkim.gov.in

শ্রী লক্ষণ প্রসাদ আচার্য
রাজ্যপাল

প্রেম সিং তামাং
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

সিকিম
ভারতের লুকানো রত্ন

রীতা রাণী দেবনাথ

সিকিম পূর্ব হিমালয় রেঞ্জে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভুটান, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে এর সীমানা। সিকিম শিলিগুড়ি করিডোরের কাছাকাছি, যা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী। রাজ্যটির আয়তন ৭,০৯৬ বর্গকিলোমিটার, যা গোয়ার পরে মোট আয়তনে ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। প্রায় পুরো রাজ্যটি পাহাড়ি। ল্যান্ডস্কেপটি রুক্ষ পাহাড়, গভীর উপত্যকা, দ্রুত প্রবাহিত নদী এবং রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারী বনভূমি। রাজ্যের পশ্চিম এবং দক্ষিণে অসংখ্য তুষারযুক্ত স্রোত নদী উপত্যকা তৈরি করেছে। এই স্রোতগুলো প্রধান তিস্তা নদী এবং এর উপনদী, রঙ্গিতের সাথে মিলিত হয়, যা উত্তর থেকে দক্ষিণে রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়

হিমালয় পর্বতমালা সিকিমের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত ঘিরে রেখেছে আর নিম্ন হিমালয় রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

ইতিহাস

সিকিমের একটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। এখানে মূলত লেপচা, ভুটিয়া এবং নেপালিসহ বিভিন্ন উপজাতি এবং জাতিগোষ্ঠী বসবাস করত। লেপচাদের এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা বলে মনে করা হয়। সিকিম ১৭ শতকে নামগিয়াল রাজবংশের অধীনে একটি বৌদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, যারা এই অঞ্চলটি ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শাসন করেছিল।

১৯ শতকে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই এলাকায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৮৯০ সালে, সিকিম ব্রিটিশ ভারতের একটি সংরক্ষিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, সিকিম ভারতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল কিন্তু একটি স্বাধীন রাজতন্ত্র ছিল। যাইহোক, ২০ শতকের শেষের দিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে।

১৯৭৫ সালে, একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং সিকিমের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। ফলে, সিকিম ১৬ মে, ১৯৭৫ সালে ভারতীয় ইউনিয়নের ২২তম রাজ্যে পরিণত হয়। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়, এবং সিকিম একটি গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করে।

জাতিসত্তা

সিকিমের অধিবাসীদের অধিকাংশই নেপালি জাতিগত। স্থানীয় সিকিমিজরা ভুটিয়াদের নিয়ে গঠিত, যারা ১৪ শতকে তিব্বতের খাম জেলা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং লেপচারা, যারা ভুটিয়াদের প্রাক-তারিখ বলে মনে করা হয় এবং তারা প্রাচীনতম পরিচিত বাসিন্দা। তিব্বতিরা বেশিরভাগই রাজ্যের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বাস করে। অভিবাসী বাসিন্দা সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে বাঙালি, বিহারি এবং মারোয়ারি।

সরকার এবং প্রশাসন

সিকিমের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর গ্যাংটক। সিকিমের একটি এককক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা রয়েছে এবং রাজ্যটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অনুসরণ করে। সরকারের প্রধান হলেন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা সমর্থিত। সিকিমের রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে মাননীয় রাজ্যপাল হলেন শ্রী লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রী প্রেম সিং তামাং এবং প্রধান সচিব হলেন শ্রী ভি বি পাঠক।

সিকিমের ছয়টি জেলা রয়েছে : গ্যাংটক, মাঙ্গান, নামচি, পাকিয়ং, গেইজিং এবং সোরেং।

জনসংখ্যা

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৬১০,৫৭৭ জন বাসিন্দা নিয়ে ভারতের সর্বনিম্ন জনবহুল রাজ্য সিকিম। সিকিম হলো সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৮৬ জন বাস করে। ২০১১ সালে রেকর্ড করা হয়েছে মোট ৩২১,৬৬১ জন পুরুষ এবং ২৮৬,০২৭ জন মহিলা।

পর্যটন

শক্তিশালী এবং মহিমান্বিত পর্বতমালা, সবুজ উপত্যকা, প্রান্তর এবং সাহসিকতার অনুভূতি, মনোরম খাবার, শান্তিপূর্ণ এবং অপরাধমুক্ত রাজ্য, জীববৈচিত্র্যের উষ্ণ স্থান এবং পৃথিবীর যেকোনো স্থানের ভ্রমণকারীদের জন্য আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে এমন উপাদানের মিশ্রণ, সিকিমকে পরিণত করেছে পর্যটনের জন্য হট ডেস্টিনেশন। রাজ্যের শ্বাসরুদ্ধকর ল্যান্ডস্কেপ, তুষারাবৃত পর্বতমালা, সুন্দর মঠ এবং দুঃসাহসিক ভ্রমণের সুযোগ সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্যাংটক (রাজধানী শহর), সোমগো লেক, ইয়ুমথাং উপত্যকা, নাথু লা পাস, পেলিং এবং রুমটেক মঠ।

সিকিম ভ্রমণের জন্য প্রায় সব ধরনের পরিবহন ব্যবস্থাই রয়েছে। পৃথিবীর এই স্বর্গটি আকাশপথ, রেলপথ এবং সড়কপথ দ্বারা ভালোভাবে সংযুক্ত। পাহাড়ি রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও, সিকিমের পরিবহন আরামদায়ক এবং বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর উপত্যকায় যাত্রা উপভোগ করার জন্য উপযুক্ত।

সিকিমের মুকুট গৌরব হলো মাউন্ট কাঞ্চনজংঘা, বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বত। দুর্দান্ত তুষার এবং বরফের দৃশ্যের সাথে এটি প্রায়শই বিশ্বের শিখরগুলোর মধ্যে অবিসংবাদিত রাজা হিসেবে বিবেচিত হয়। এর সাথে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়, প্রত্যেকের নিজস্ব স্বতন্ত্র উৎসব এবং ঐতিহ্য, নাচ এবং সঙ্গীত; এটিতে এমন সমস্ত উপাদান রয়েছে যা ভ্রমণকে একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা করে। সিকিমে রয়েছে গুরু পদ্মসম্ভবের ১৩৫ ফুট লম্বা মূর্তি।

পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দর যা গ্যাংটক থেকে মাত্র ১২৪ কিলোমিটার দূরে সিকিম ভ্রমণকারীদের জন্য পাকিয়ং বিমানবন্দরের বিকল্প। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসসহ প্রায় সমস্ত দেশীয় বিমান সংস্থা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে নিয়মিত ফ্লাইট চালায়। বাগডোগরা সিকিম পর্যটন উন্নয়ন দ্বারা পরিচালিত দৈনিক হেলিকপ্টার পরিষেবা দ্বারা গ্যাংটকের সাথেও যুক্ত। কর্পোরেশন এবং বাগডোগরা থেকে গ্যাংটক পৌঁছতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লাগবে।

বিখ্যাত মঠ : সিকিম তার সুন্দর মঠগুলোর জন্য বিখ্যাত, যা উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সিকিমে ৭৫টি বৌদ্ধ মঠ রয়েছে, যা ১৭০০ এর দশকের প্রাচীনতম। কিছু উল্লেখযোগ্য মঠের মধ্যে রয়েছে রুমটেক মঠ, এনচে মঠ, পেমায়াংটসে মঠ এবং তাশিডিং মঠ।

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম : সংস্কৃতি, দৃশ্যাবলি এবং জীববৈচিত্র্যের কারণে সিকিম একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য।

সিকিম রোমাঞ্চ-সন্ধানীদের জন্য বিভিন্ন দুঃসাহসিক কার্যকলাপ অফার করে। ট্রেকিং একটি জনপ্রিয় ক্রিয়াকলাপ, যেখানে গোয়েচালা ট্রেক এবং জোংরি ট্রেকের মতো ট্রেকগুলো অ্যাডভেঞ্চার উৎসাহীদের আকর্ষণ করে। রাজ্যটি রিভার রাফটিং, মাউন্টেন বাইকিং এবং প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্যও পরিচিত।

ধর্ম

প্রধান ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম এবং বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম। ২০১১ সালের হিসাব অনুসারে হিন্দু ধর্ম (৫৭.৭৬%), বৌদ্ধ ধর্ম (২৭.৩৯%), খ্রিষ্টধর্ম (৯.৯১%), ইসলাম (১.৬২%), শিখ ধর্ম (০.৩১%), জৈন ধর্ম (০.০৫%), অন্যান্য বিশ্বাস যেমন কিরাত মুন্ধুম, বন, মুন (২.৬৭%), কোনো ধর্ম নেই (০.৩%)। লেপচা জনগণের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম হলো মুন, একটি অ্যানিমিস্ট প্রথা যা বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের সাথে সহাবস্থান করে।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সিকিম হলো বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির একটি রাজ্য এবং এটি বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। তিনটি প্রধান সম্প্রদায় হলো লেপচা, ভুটিয়া এবং নেপাল। প্রত্যেকেই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অবদান রাখে। সিকিমের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

উৎসবগুলো রাজ্যের সংস্কৃতিতে একটি অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে এবং এখানে উদ্‌যাপন করা কয়েকটি প্রধান উৎসব হলো লোসার (তিব্বতি নববর্ষ), সাগা দাওয়া, দশইন, তিহার এবং মাঘে সংক্রান্তি। রাজ্যের প্রাণবন্ত লোকনৃত্য এবং সঙ্গীত এই উৎসবগুলোর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা এর জনগণের রঙিন ঐতিহ্য এবং অনুশীলনগুলোকে প্রদর্শন করে।

সিকিমের নেপালি সংখ্যাগরিষ্ঠরা তিহার (দীপাবলি) এবং দশইন (দশহরা) সহ সমস্ত প্রধান হিন্দু উৎসব উদ্‌যাপন করে। ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় উৎসব, যেমন মাঘে সংক্রান্তি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, হোলি, শিবরাত্রি, নবরাত্রি, সাকেলা, চাসোক তংনাম এবং ভীমসেন পূজা জনপ্রিয়। লোসার, সাগা দাওয়া, লাবাব ডুচেন, দ্রুপকা তেশি এবং ভুমচু সিকিমে পালিত বৌদ্ধ উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম।

খেলাধুলা

জনপ্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, তিরন্দাজ, ভলিবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং অ্যাথলেটিক্স। প্যারাগ্লাইডিং, হাইকিং এবং মাউন্টেন বাইকিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসও সিকিমে জনপ্রিয়।

রসনাবিলাস

নুডলভিত্তিক খাবার যেমন থুকপা, চৌ মেইন, থেনথুক, ফাকথু, গায়াথুক এবং ওয়ান্টন সিকিমে সাধারণ। মোমোস : সবজি, মুরগি, মাটন, গরুর মাংস বা শুয়োরের মাংসে ভরা বাষ্পযুক্ত ডাম্পলিং এবং স্যুপের সাথে পরিবেশন করা হয় একটি জনপ্রিয় স্ন্যাক।

সিকিমে বিয়ার, হুইশকি, রাম এবং ব্র্যান্ডি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়, যেমন টংবা, একটি বাজরাভিত্তিক অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় যা নেপাল এবং দার্জিলিংয়ে জনপ্রিয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পরে সিকিম সব ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে মাথাপিছু মদ্যপানের হার তৃতীয় সর্বোচ্চ।

ভাষা

আধুনিক সিকিম একটি বহুজাতিক এবং বহুভাষিক ভারতীয় রাজ্য। সিকিমের সরকারি ভাষাগুলো হলো নেপালি, ইংরেজি, সিকিমিজ এবং লেপচা। নেপালি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে কথ্য ভাষা এবং প্রশাসনিক উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। সিকিমে কথ্য সমস্ত প্রধান ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা

শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সিকিম সরকার রাজ্যের বাজেটের প্রায় ২০% ব্যয় প্রদান করে। ২০১১ সালে, সিকিমের প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিল ৮২.২ শতাংশ : পুরুষদের জন্য ৮৭.২৯ শতাংশ এবং মহিলাদের জন্য ৭৬.৪৩ শতাংশ। রাজ্যে মোট ১,১৫৭টি বিদ্যালয় রয়েছে, যার মধ্যে রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত ৭৬৫টি বিদ্যালয়, সাতটি কেন্দ্রীয় সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৮৫টি বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। সিকিমে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা প্রদান করে।

অর্থনীতি

সিকিমের অর্থনীতি মূলত কৃষি, উদ্যানপালন এবং পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। রাজ্যটি তার এলাচ এবং কমলা উৎপাদনের জন্য পরিচিত, যা প্রধান অর্থকরি ফসল। এই অঞ্চলে উৎপন্ন অন্যান্য ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, ভুট্টা, আদা এবং চা।

পার্বত্য অঞ্চল এবং দুর্বল পরিবহন পরিকাঠামোর কারণে, সিকিমে বড় আকারের শিল্প ভিত্তির অভাব রয়েছে। মদ্যপান, পাতন, ট্যানিং এবং ঘড়ি তৈরি প্রধান শিল্প এবং প্রধানত রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে, প্রাথমিকভাবে মেলি এবং জোরেথাং শহরে অবস্থিত। এছাড়াও সিকিমে তামা, ডলোমাইট, ট্যালক, গ্রাফাইট, কোয়ার্টজাইট, কয়লা, দস্তা এবং সীসার মতো খনিজ আহরণের জন্য একটি ছোট খনির শিল্প বিদ্যমান।

কৃষি

সিকিম ২০০৩ এবং ২০১৬ এর মধ্যে তার কৃষিকে সম্পূর্ণরূপে জৈব রূপান্তর করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জন করে এবং এই পার্থক্য অর্জনকারী ভারতের প্রথম রাজ্য হয়ে ওঠে। কৃষি এখনো সিকিমের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান আশ্রয়। প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান এবং কঠিন ভূখণ্ডের কারণে চাষের আওতাধীন এলাকার সম্প্রসারণ সীমিত। মাথাপিছু জমির খুব কম প্রাপ্যতা এবং কৃষকদের খামারে কাজ করার প্রবণতা হ্রাস, বেশিরভাগ অংশ পাথুরে, প্রবল ঢালের কারণে জমি কৃষির জন্য অনুপযুক্ত–এসব প্রতিকূলতার পরও কিছু পাহাড়ি ঢাল সোপান খামারে রূপান্তরিত হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

সামাজিক-রাজনৈতিক দিক ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে শিল্পের বৃদ্ধি অসাধারণ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সিকিমের কিছু শিল্প বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে–
১. ফার্মাসিউটিক্যালস। ২. ইকো-ট্যুরিজম (হোটেল)। ৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। ৪. ব্রুয়ারিজ। ৫. প্রসাধনী। ৬. নিরাপত্তা কালি। ৭. গদি। ৮. ঢেউতোলা বাক্স।

স্বাস্থ্যসেবা

সিকিম ভারতের প্রথম রাজ্যে পরিণত হয়েছে যেটি ১০০ শতাংশ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন করেছে।

১৪৮টি সাব সেন্টার, ২টি সিএইচসি, ২৪টি পিএইচসি, ৪টি জেলা হাসপাতাল, একটি স্টেট রেফারেল হাসপাতাল এবং ১টি মেডিক্যাল কলেজসহ বেসরকারি পাবলিক পার্টনারশিপ এবং এনজিওগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে রাজ্যটি।

জলবায়ু

রাজ্যে পাঁচটি ঋতু রয়েছে : শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, শরৎ এবং বর্ষা। সিকিমের অধিকাংশ অধ্যুষিত অঞ্চল একটি নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অনুভব করে, গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব কমই ২৮° সেলসিয়াস (৮২° ফারেনহাইট) ছাড়িয়ে যায়। সিকিমের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ১৮° সেলসিয়াস (৬৪° ফারেনহাইট)।

সিকিম ভারতের কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে একটি যেখানে নিয়মিত তুষারপাত হয়। তুষার রেখা রাজ্যের দক্ষিণে ৬,১০০ মিটার (২০,০০০ ফুট) থেকে উত্তরে ৪,৯০০ মিটার (১৬,১০০ ফুট) পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরের তুন্দ্রা-টাইপ অঞ্চলটি প্রতি বছর চার মাস তুষারাবৃত থাকে এবং প্রায় প্রতি রাতে তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস (৩২° ফারেনহাইট) এর নিচে নেমে যায়। উত্তর-পশ্চিম সিকিমে, শিখরগুলো সারা বছরই হিমায়িত থাকে; উচ্চতার কারণে, শীতকালে পাহাড়ের তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াস (৪০° ফারেনহাইট) পর্যন্ত নেমে যেতে পারে।

বন ও পরিবেশ

এটি ভারতের সবচেয়ে পরিবেশ সচেতন রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে 'যেকোনো সরকারি অনুষ্ঠানে এবং সভাগুলোতে' প্লাস্টিকের জলের বোতল এবং পলিস্টাইরিন পণ্য (রাজ্যজুড়ে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সিকিম রাজ্যে তার ভৌগোলিক এলাকার ৮২.৩১% জুড়ে সবচেয়ে বেশি নথিভুক্ত বনভূমি রয়েছে।

পর্বতমালা, সুন্দর পাহাড় এবং উপত্যকা, স্ফটিক স্বচ্ছ জলপ্রপাত, ঝরনা এবং হ্রদ, নদী ও স্রোত, খাড়া এবং জলাবদ্ধ ভূখণ্ড, তুষার আচ্ছাদিত পাহাড়, ৩১০ মিটার (জোরেথাং) থেকে ৮৫৮৬ মি (মোউন্ট) উচ্চতা পর্যন্ত নিচু ভূমি দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে। বনভূমি উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের বিভিন্ন রূপের সাথে সৌন্দর্যময়। রাজ্যটি পূর্ব হিমালয়ে অবস্থিত যা একটি জীববৈচিত্র্যের হটস্পট। সিকিমের বনাঞ্চলে স্থানীয় উদ্ভিদ, বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী, উচ্চমূল্যের ঔষধি গাছ ইত্যাদি রয়েছে। সিকিম উদ্ভিদবিজ্ঞানের স্বর্গরাজ্য।

সাতটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং রাজ্যের একমাত্র জাতীয় উদ্যান যা জুলাই ২০১৬ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

সিকিম প্রায় ৫০০০ প্রজাতির ফুলের গাছ, ৫১৫টি বিরল অর্কিড, ৬০টি প্রিমুলা প্রজাতি, ৩৬টি রডোডেনড্রন প্রজাতি, ১১টি ওক প্রজাতি, ২৩টি বাঁশের জাত, ১৬টি কনিফার প্রজাতি, ৩৬২ ধরনের ফার্ন এবং ৯০টি ফার্ন এবং ৮০টি গাছের আবাসস্থল। ঔষধি গাছ স্থানীয়ভাবে 'ক্রিসমাস ফ্লাওয়ার' নামে পরিচিত যা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নোবেল ডেনড্রোবিয়াম হলো সিকিমের সরকারি ফুল, আর রডোডেনড্রন হলো রাষ্ট্রীয় গাছ।

জীববৈচিত্র্য

সিকিম তার বিভিন্ন উচ্চতা এবং জলবায়ু অবস্থার কারণে চিত্তাকর্ষক জীববৈচিত্র্যের গর্ব করে। রাজ্যটি বিভিন্ন বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতিসহ বিস্তৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল। কাঞ্চনজংঘা জাতীয় উদ্যান, একটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান এলাকা এবং সিকিমের প্রাণিজগতের মধ্যে রয়েছে তুষার চিতা, কস্তুরি হরিণ, হিমালয়ান তাহর, রেড পান্ডা, হিমালয়ান মারমোট, হিমালয়ান সেরো, হিমালয়ান গরাল, মুন্টজ্যাক, কমন ল্যাঙ্গুর, এশিয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, ক্লাউডেড চিতা, মার্বেল বিড়াল, চিতাবাঘ বিড়াল, ঢোল, তিব্বতি নেকড়ে, হগ ব্যাজার, বিন্টুরং এবং হিমালয় জঙ্গলের বিড়াল। আল্পাইন অঞ্চলে সাধারণত যে প্রাণীগুলো পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ইয়াকগুলো প্রধানত তাদের দুধ, মাংস এবং বোঝার পশু হিসেবে পালন করা হয়। সিকিমের অ্যাভিফানাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইম্পিয়ান ফিজেন্ট, ক্রিমসন হর্নড ফিজ্যান্ট, স্নো পার্টট্রিজ, তিব্বতি স্নোক, দাড়িওয়ালা শকুন এবং গ্রিফন শকুন, সেইসাথে সোনার ঈগল, কোয়েল, প্লভার, উডকক, স্যান্ডপাইপার, কবুতর, ওল্ড ওয়ার্ল্ড ফ্লাইক্যাচার্স এবং ফ্লাইক্যাচার্স। সিকিমে ৫৫০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটিকে বিপন্ন ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া প্রায় ১,৪৩৮ প্রজাপতির মধ্যে ৬৯৫টি সিকিমে রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিপন্ন কায়সার-ই-হিন্দ, হলুদ গরগন এবং ভুটান গ্লোরি।

পরিবহন

আকাশপথ : সিকিমের প্রথম বিমানবন্দর, পাকিয়ং গ্রামে অবস্থিত পাকিয়ং বিমানবন্দর, গ্যাংটকের ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ডিক্লিং মনাস্ট্রি এবং জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রের পাশাপাশি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৫০০ ফুট ওপরে।

রেলপথ : নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি হলো পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সিকিমের নিকটবর্তী দুটি রেল স্টেশন। এনজেপি ১২৫ কিলোমিটার এবং শিলিগুড়ি গ্যাংটক থেকে ১১৪ কিলোমিটার দূরে এবং সমস্ত বড় শহরের সাথে ভালোভাবে সংযুক্ত।

সড়কপথ : সিকিমের জাতীয় মহাসড়ক 31A গ্যাংটককে শিলিগুড়ির সাথে সংযুক্ত করে এবং এই মনোরম মহাসড়কটি একদিকে তিস্তা নদীর তীরে সবুজ বনের মধ্য দিয়ে চলে এবং অন্যদিকে পূর্ব হিমালয়ের আকাশ ছোঁয়া পর্বতমালা। প্রায় দুই ঘণ্টার এই অনন্য রাইডটি অসংখ্য বুনো ফুলের গালিচায় সাজানো উপত্যকা উপভোগ করার সুযোগ দেবে। S.N.T দ্বারা পরিচালিত নিয়মিত বাস পরিষেবা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাইভেট বাস, জিপ এবং ট্যাক্সি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

সিকিম হেলিকপ্টার সার্ভিস : গ্যাংটক থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর পর্যন্ত হেলিকপ্টার পরিষেবা রয়েছে। পাঁচ আসনবিশিষ্ট হেলিকপ্টারটি কেবল সংযোগকারী ফ্লাইটগুলোর সাথে যুক্ত নয়, সিকিমকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য এ এক দারুণ সেবা।

সিকিম ভারতের একটি লুকানো রত্ন যার প্রাকৃতিক দৃশ্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এটি এমন একটি রাজ্য যা দুঃসাহসিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রশান্তির এক অনন্য মিশ্রণ প্রদান করে।

রীতা রাণী দেবনাথ
শিক্ষক

অর্থনীতি

রুপিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সুবিধা

অনিন্দ্য আরিফ

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রুপির ব্যবহার শুরু হওয়ায় এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে ভারত-বাংলাদেশ। এখন থেকে ভারতের সঙ্গে ডলারের পাশাপাশি রুপিতেও বাণিজ্য করা যাবে। আর দুই দেশের বাণিজ্য ব্যবধান কমলে টাকাতেও বাণিজ্য করা যাবে। নিজস্ব মুদ্রায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য করার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য বলছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ডলারের দর বাড়ছেই আর দরপতন হচ্ছে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় মুদ্রার। এমন এক পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ভারতীয় মুদ্রা রুপিকে নতুন গুরুত্বে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। নিজস্ব মুদ্রাকে শক্তিশালী করার বিষয়ে রাশিয়ার উদাহরণটিকে অনুসরণ করতে চাইছে ভারত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে রাশিয়া। তখন বিকল্প পথ বের করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিন ঘোষণা করেন, ইউরোপের দেশগুলো যদি রাশিয়া থেকে গ্যাস নিতে চায়, তাহলে ইউরো বা ডলার দিলে হবে না, দিতে হবে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল। পুতিনের কাছে হিসাব ছিল পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো ৪০ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে রাশিয়া থেকে

এ দাওয়াই কাজে দেয় এবং রুবলের মান বাড়তে থাকে। এখন ডলারের আধিপত্যের বাইরে ভারতও রাশিয়ার পথ অনুসরণ করতে চাইছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইতোমধ্যে ভারতীয় মুদ্রায় আন্তর্জাতিক লেনদেন করার আইনি বাধা দূর করেছে।

ইতোমধ্যে রাশিয়া, মরিশাস, ইরান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারত রুপিতে বাণিজ্যও শুরু করেছে। এর আগে বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে ১৯৬০-এর দশকে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান–এসব দেশ ভারতীয় রুপি গ্রহণ করত। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন তথ্যসূত্র বলছে, বর্তমানে ভারত প্রায় ১৮টি দেশের সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য তৎপরতা পরিচালনা করছে।

এখন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রুপিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শুরু করার উদ্যোগের পেছনে চারটি কারণ কাজ করছে। প্রথমত, ডলার-সংকটে রয়েছে উভয় দেশ। ফলে উভয় দেশ এতে লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের দুবার মুদ্রা বিনিময় করার খরচ কমবে। তৃতীয়ত, লেনদেন নিষ্পত্তিতে সময় বাঁচবে। চতুর্থত, অন্য উদ্বৃত্ত মুদ্রা রুপিতে রূপান্তর করে লেনদেন নিষ্পত্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

প্রায় এক দশক ধরে টাকা ও রুপিতে উভয় দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার আলাপ চলছে। অবশেষে অতি সম্প্রতি কাজটি বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশের দুই ব্যাংক এবং ভারতের দুই ব্যাংকে নস্ট্র হিসাব খুলেছে। এক দেশের এক ব্যাংক অন্য দেশের কোনো ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের উদ্দেশে হিসাব খুললে সে হিসাবকে নস্ট্র হিসাব বলা হয়ে থাকে।

রুপিতে বাণিজ্য শুরু করার মাধ্যমে এই মুদ্রাটি এক লাফে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিণত হবে না ঠিকই, কিন্তু আঞ্চলিক মুদ্রায় রূপান্তরিত হওয়ার পথটি অগ্রসর হবে। এক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের পরামর্শটিকে বিশেষ গুরুত্বসহ দেখা যেতে পারে। তারা বলছেন, রুপিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী করতে চাইলে ভারতকে পণ্য রফতানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। ভারত উৎপাদনশীলতা বাড়ালে ও বিশ্বের দেশগুলোকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারলে রুপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। নিজেদের রফতানি মান না বাড়িয়ে শুধু দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে রুপিকে সর্বজনীন রূপ দেওয়া যাবে না। তবে নিঃসন্দেহে, ডলারের পরিবর্তে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে রুপির ব্যবহার শুরু হওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরও মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

এমনিতে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আমদানি-রপ্তানির বৃহৎ বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৮ হাজার ৯১৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ১ হাজার ৩৬৯ কোটি ডলারের পণ্যই আমদানি হয় ভারত থেকে। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করে ১৯৯ কোটি ডলারের পণ্য। আমদানি-রপ্তানি মিলিয়ে উভয় দেশের মধ্যে ১ হাজার ৫৬৮ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয় ওই অর্থবছরে। বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরেও একই প্রবণতা দেখা গেছে।

অর্থনীতির পরিভাষায়, ডলার বা অন্য কোনো হার্ড কারেন্সিকে এড়িয়ে দুটি দেশ যখন নিজেদের মধ্যে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য চালায়, সেটাকে 'কারেন্সি সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্ট' বলা হয়। আর্থিক জগতে এ ধরনের মুদ্রা বিনিময়কে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মুদ্রাকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাই এখন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে টাকা ও রুপির ব্যবহারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য বৃহত্তর উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্যোগজনিত পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ হবে মুদ্রা বিনিময়ের কাঠামো তৈরি করা, যা ইতোমধ্যে চুক্তিসম্পাদন ও প্রাথমিক লেনদেনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পর্যায় কাজ হবে রুপি ও টাকার চাহিদা ও জোগানে ভারসাম্য রক্ষা করা। যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য রুপির চাহিদা বেশি ও জোগান কম, তাই ভারতকেই এগিয়ে আসতে হবে জোগান বৃদ্ধির সহজতর উপায় নিয়ে। জোগান বৃদ্ধির সহজতর উপায় হলো বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি আমদানি করা এবং যারা রুপিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছে না, তাদের নিকট থেকে আমদানি যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া।

অনেক বিশ্লেষক ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন, এ ধরনের বিনিময় সফল হবে না। সত্য হলো, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ ভ্রমণের জন্য ও চিকিৎসার জন্য ভারতে যায়। এ ধরনের ভ্রমণের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় অন্যদিকে ভারত থেকে অনেক শিক্ষার্থী মেডিকাল শিক্ষার জন্য বাংলাদেশে পড়তে আসে। ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা প্রয়োজন। এর ফলে বাংলাদেশে রুপির জোগান কিছু হলেও বৃদ্ধি পাবে। ডলার এনডোর্স করার বিপরীতে রুপির ব্যবহারের সুযোগ থাকায় ভারতীয়দেরও মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য দুই দেশের মুদ্রায় সহজে বিনিময় সম্ভব এমন একটি প্লাস্টিক কার্ড অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করাও একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ বিনিময় ও বাণিজ্যকে যত বেশি সহজতর করা হবে তত বেশি দুই দেশের মধ্যে রুপি ও টাকার বিনিময় বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা ও জোগানে সামঞ্জস্যতা থাকবে।

আরেকটি বিষয় দুই দেশকেই লক্ষ রাখতে হবে তা হলো–অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে ধরে রাখা, কারণ অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতি দুই দেশের মুদ্রা বিনিময়কেও অস্থির করবে তখন আবার সবাই ডলারে ফিরে যেতেই পরামর্শ দেবে বা স্বাভাবিক গতিতেই এমনটি হবে। এখানে বৈধ রুপি আয়ের বিষয়টিকে অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। এজন্য বাংলাদেশকে রুপি আয় করার স্ট্যান্ডার্ড বা আন্তর্জাতিক মানসম্মত বাণিজ্য কূটনীতি সচল করতে হবে। সেখানে চারটি বিষয়কে বিবেচনায় আনার জরুরত রয়েছে–

এক. কয়েক বছর আগে ভারত বাংলাদেশি কিছু পণ্যে শুল্ক উঠিয়েছে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ভারতে এক বিলিয়ন ডলার পৌঁছেছিল। আশা করা হচ্ছিল, এটি দুই বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে খুব দ্রুত। এক্ষেত্রেও ভারতে ছোট ও বড় পরিসরের যেসব পণ্যভিত্তিক পরোক্ষ রপ্তানি বাধা রয়েছে সেগুলো তুলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

দুই. বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে চীন ২০২০ সালের জুলাই থেকে ট্যারিফ লাইনের আওতায় ৯৭ শতাংশ (আগের ৬১ শতাংশ) বাংলাদেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা চালু করেছে। সেক্ষেত্রে ভারতও রপ্তানির বিষয়ে শতভাগ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে।

তিন. ভারত পাট, পাটজাত পণ্য, বাংলাদেশে তৈরি হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও মাছ ধরার জালের ওপর অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করায় বাংলাদেশের কিছু খাতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব অ্যান্টি ড্যাম্পিং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাণিজ্য বাধা তুলে দেয়ার মাধ্যমে রুপি সোয়াপের পথ সুগম করা যেতে পারে।

চার. শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণ। রপ্তানির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি বলে বাংলাদেশ মূলত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা জমা করে। এক্ষেত্রেও রুপিতে 'কারেন্সি সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্ট'-এর বিষয়ে ভারতে বাংলাদেশিদের শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত যেকোনো মুদ্রার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি অবশ্যই সহজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশকে তার নিজস্ব শর্তে ভারতের রুপিতে সহজলভ্য প্রবেশাধিকার (স্ট্যান্ডার্ড ইকোনমিক অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাকসেস) নিশ্চিত করতে হবে। তাই বাংলাদেশ রুপি কীভাবে আয় করবে এবং রুপির বিপরীতে টাকার দরপতন কীভাবে ঠেকানো হবে, এই দুটো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে এগোতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়েই বাংলাদেশ ও ভারতের যে বিনিময় হারের সূচনা হয়েছে; তাকে স্থায়ী বা টেকসই বিনিময় হিসেবে টিকিয়ে রাখা যাবে।

অনিন্দ্য আরিফ
সাংবাদিক

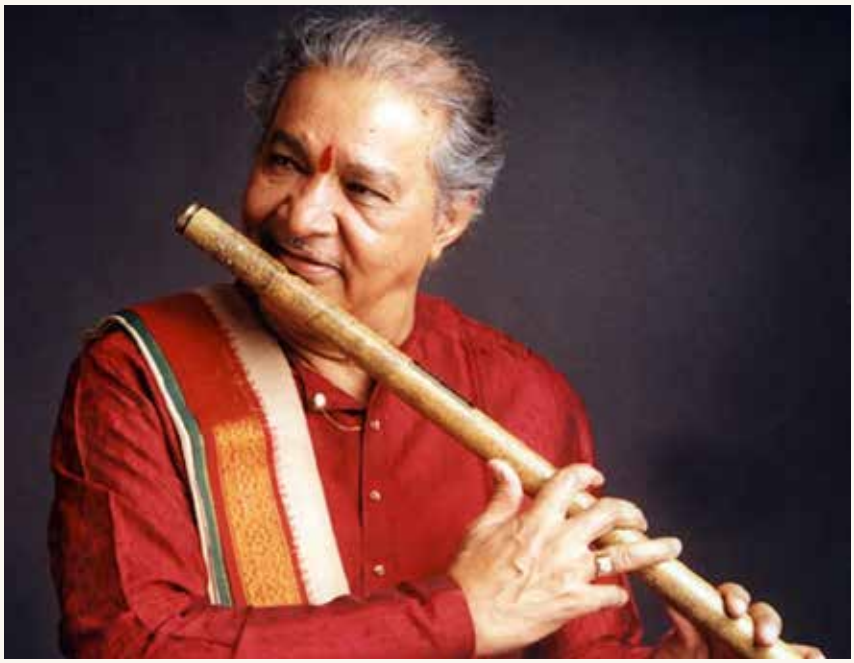

পণ্ডিত শ্রী হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া

ড. পূনম গুপ্তা

ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব শ্রী হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া তার প্রতিভার মাধ্যমে বিশ্বের সেরা বাঁশিবাদকের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি ১৯৩৮ সালের ১ জুলাই ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হেদিলাল চৌরাশিয়া একজন কুস্তিগীর ছিলেন এবং পাশাপাশি তিনি ধানের ব্যবসায় করতেন। তার বাবা হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়াকে একজন কুস্তিগীর বানাতে চেয়েছিলেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে জীবন থেকে মায়ের ছায়া উঠে যায়। বাবা হরিপ্রসাদকে লালন পালন করতেন এবং মাঝে মাঝে নিজের আখড়ায় নিয়ে যেতেন। হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া নিজের বাবাকে না বলেই গান শেখা আরম্ভ করেন। তিনি সংগীত শিক্ষা শুরু করেন প্রতিবেশী পণ্ডিত রাজরামের কাছে। তিনি বারনাসির পণ্ডিত ভোলানাথ প্রাসানের কাছে ১৫ বছর বয়সে বাঁশি বাজানো শেখা শুরু করেন। সংগীত শেখার পর তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও, কটক এবং উড়িষ্যাগর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী হিসেবে কাজ করেন। তিনি সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আশায় তিনি অন্নপূর্ণা দেবীর সান্নিধ্যে আসেন।

১৯৬২ সালে অন্নপূর্ণা দেবী শর্ত দিয়েছিলেন, আগে যত রাগ শিখেছিলেন তা ভুলে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত রেখেছিলেন বাম হাতে বাঁশি বাজানো যাবে না, ডান হাতে বাঁশি বাজাতে হবে। পণ্ডিত হরিপ্রসাদজি তার বাঁশি দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে জনপ্রিয় করার কাজটি করেছিলেন। তিনি অনেক ভারতীয় চলচ্চিত্রে পণ্ডিত শিব শঙ্কর শর্মার সাথে সুরেলা সংগীত রচনা করেছিলেন। তিনি চাঁদনী, ডর, লামহে, সিলসিলা, ফসলে, বিজয়, আদি অনেক জনপ্রিয় ফিল্মে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তার সকল রচনা মানুষের মনের মধ্যে এক আজ পর্যন্ত গেঁথে আছে।

পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন পদকে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি ইউরোপে বিশ্বসঙ্গীত বিভাগের নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন।

পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়াকে ফরাসি সরকার 'নাইট অব থি অর্ডার অব আর্টস এন্ড লেটস' পুরস্কারের ভূষিত করেন। ব্রিটেনের রাজপরিবার তার সংগীতের সুরে মুগ্ধ ছিলেন। ব্রিটেনের রাজপরিবার তাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। ১৯৮৪ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার, ১৯৯২ সালে কোনাক পুরস্কার ও পদ্মভূষণ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে যশ ভারতী পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে কালিদাস সম্মান ও ২০০০ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

তিনি ২০০৮ সালে ভারতের উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এবং ২০১৩ সালে NDtv কর্তৃক আয়োজিত ভারতবর্ষের মহানতম জীবিত কিংবদন্তি হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। আরও ২০১৫ সালে পণ্ডিত চতুর লাল পুরস্কার লাভ করেন। পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া আধুনিক বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শাস্ত্রীয় সংগীত অনুষ্ঠানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেন। পণ্ডিত শ্রী হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে সর্বদাই এক অনন্য উচ্চতায় থাকবেন। •

ড. পূনম গুপ্তা
আইসিসিআর হিন্দি চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ
ভারত বিচিত্রা
লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। – সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Branch Name :.....
e-mail :..... Routing No :.....

১৮ জুলাই ২০২৩-এ, মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট জনাব জসিম উদ্দিন ও চেম্বারের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ পরিচালকগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এবং মিসেস মনু ভার্মা ১৯ জুলাই, ২০২৩-এ ঢাকাস্থ ইন্ডিয়া হাউজে সফররত ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে আমন্ত্রণ জানান। হাই কমিশনার ভার্মা সফরকারী ভারতীয় দলকে স্বাগত জানান এবং চলমান বাংলাদেশ সফরে তাঁদের ক্রীড়াদক্ষতার প্রশংসা করেন।

ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেললাইনের জন্য আধুনিক কম্পিউটার-ভিত্তিক ইন্টারলকড্ সিগন্যালিং সিস্টেম প্রকল্পের একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২৩ জুলাই ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ২৪ জুলাই ২০২৩-এ ভারতীয় রেয়াতি লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন-এ উন্নীতকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন।

২৯ জুলাই ২০২৩-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিটে একটি ভারত-বাংলাদেশ স্টার্টআপ ব্রিজ সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারত ও বাংলাদেশের স্টার্টআপ কমিউনিটির উদ্দেশ্যে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বক্তব্য প্রদান করেন।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, July, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।